

লেনিন ছিলেন আমাদের পার্টির পাহাড়ি ঈগল
: পৃষ্ঠা ৫

মন্দির ও মসজিদ : কাজী নজরুল ইসলাম :
পৃষ্ঠা ৫

জনমনে প্রশ্ন, কী হচ্ছে দেশে? : পৃষ্ঠা ৯

রামিসা; ধর্ষণ-হত্যার শাস্তি এবং প্রতিকারের
সংগ্রাম : শেষ পৃষ্ঠা

পোশাকি পরিবর্তন নয়, পরিবর্তন প্রয়োজন মূলে

ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং অভ্যুত্থানের অনেক দৃষ্টান্ত মানুষ তৈরি করলেও অভ্যুত্থানের পরও কেন প্রত্যাশা পূরণ হয় না এই প্রশ্ন উঠছে বার বার। এর উত্তর পেতে অভ্যুত্থানগুলোর দিকে ভালো করে তাকানো দরকার। অভ্যুত্থানে সবাই যুক্ত হয় কিন্তু সবার উদ্দেশ্য এক নয়, তাই ফলাফল সবার প্রত্যাশা পূরণ করে না। জনগণ অভ্যুত্থান করে সমাজের প্রগতি ও পরিবর্তনের আশায়। অন্যদিকে ক্ষমতাজোগী ও ক্ষমতালোভীরা সমাজকে পতনের দিকে নিয়ে যায়, গদি দখল ও রক্ষা এবং পকেট ভারী করা আর গোষ্ঠীস্বার্থ সিদ্ধির তাড়নায়। স্বাধীনতার আগে-পরের ইতিহাস এর বাইরে বড় কিছু ঘটায়নি। কারণ ব্যবস্থা বদল না করে অবস্থার বদল করা যায় না, এই উপলব্ধি জনমনে এখনও তৈরি হয়নি আর শাসকশ্রেণিও সচেতনভাবেই তা করতে দেয়নি। ২০২৪ এর অভ্যুত্থান এবং অভ্যুত্থান পরবর্তী রাষ্ট্র পরিচালনা এর সর্বশেষ দৃষ্টান্ত।

অবস্থানের পার্থক্যের কারণে যেমন পাহাড়ের চূড়ায় থাকা আর পাহাড়ের পাদদেশে থাকা দুজনের করমর্দন সম্ভব হয় না, তেমনি লুটেরা ধনিকশ্রেণি আর শ্রমজীবী মেহনতি শ্রমিকশ্রেণির

স্বার্থকে এক সুতায় গাঁথা যায় না। সংখ্যাগরিষ্ঠ অল্প হয়েও লুটেরা ধনিকশ্রেণি লুটের ভাগ আর ক্ষমতা দখলে কিংবা ভাগাভাগিতে মারামারি-ফাটাফাটি, গালাগালি, খুনখারাবি করলেও শ্রেণি স্বার্থে এক থাকে। অথচ শ্রমজীবী শোষিতরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বেশি—প্রায় ৯৫ ভাগ হওয়া সত্ত্বেও বহু বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতায় নিজ গৃহে পরবাসী হয়ে থাকে। চেতনার ঘাটতির কারণে বুর্জোয়া দলসমূহের জার্সি পরে তাদেরই কায়কারবার কিংবা বেগার খাটুনিতে থাকতে বাধ্য হয় শ্রমজীবীরা। তাঁরা নিজেদের অজান্তেই তাদের বিপরীত শ্রেণির ভাবচিত্তাকে মনোমগ্নে লালন ও ধারণ করে চলে। শ্রমজীবীদের বিভ্রান্ত করতে একদল ইহকালের বুলি-বাণী ও লেনদেনের হিসাব বুঝায় আর একদল পরকালের চির সুখের আশ্বাস দেয়। আবার সুবিধামতো ইহকাল-পরকাল দুই কালের ব্যবস্থাপত্রও দেওয়ার চেষ্টা করে।

পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব পরিস্থিতিও বিবেচনায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী দস্যুতা নগ্নরূপ নিয়েছে, কে কতটা সম্পদ ও বাজার দখলে নেবে তার জন্য যুদ্ধ, প্রত্নি যুদ্ধ, যুদ্ধোন্মাদনা চাড়া রাখা, দুর্বল দেশের শাসকদের কোথায়ও বা ঘাড় মটকানো, কোথায়ও বা ঘাড়ে

ধরে সুবিধা আদায় চলছে। ওইসব দেশে দালাল সৃষ্টি ও দালাল রঙানি বহুগুণ বাড়ানো হচ্ছে। দেশপ্রেমের বদলে পুঁজি শ্রেমিকদের সংখ্যা যত বাড়ছে, ওদের কলকাঠি নাড়ার সুযোগ তত বাড়ছে। কিন্তু পরিস্থিতি যাই হোক না কেন; যুদ্ধ, ধ্বংস এবং সম্পদ দখল সব কিছুর দায় বহন করতে হবে শ্রমজীবী মানুষকেই।

বৈষম্যহীন সমাজের স্বপ্ন যেন সাধারণ মানুষ আকাশে তারা দেখার মতো দেখছে। দেখছে কিন্তু হাতের নাগালে না থাকায় কিছু করে উঠতে পারছে না। জনগণ যে ঐক্যের শক্তিতে এক অশুভ শক্তিকে উৎখাত করতে সক্ষম হয়েছিল তা শ্রেণিগতভাবেই আরেক অশুভ শক্তির দখলে গেছে এবং আছে। আন্দোলনে থাকা ক্ষুদ্র একটা গোষ্ঠীকে মাস্তানিতে লাগানো হয়েছিল। তারাও বুঝে না বুঝে লাভে-লাভে পড়ে ব্যবহৃত হয়েছে এবং হচ্ছে। আবার ভারতের হিন্দুত্ববাদ মোকাবিলায় দেশে মুসলমানিত্ববাদ কয়েমের চেষ্টা চলছে। এতে বড় সাম্প্রদায়িক শক্তির কাছে ছোট সাম্প্রদায়িক শক্তির পরাজয় যে নিশ্চিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা সাম্প্রদায়িকতাকে ধর্মনিরপেক্ষতা দিয়ে লড়বো। ভারতের জনগণ এবং শাসকশ্রেণিকে এক

সমীকরণে মাপলে ভুল হবে। যে আর্থিক ভিত্তির ওপর রাষ্ট্র কাঠামো এবং তার রাজনৈতিক চরিত্র দাঁড়ায় তাকে হিসাবে না রাখলে অন্ধের ভুলে অনেক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। মনে রাখতে হবে যে, ভারত একটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের মোড়ল আর ভারত আঞ্চলিক সাম্রাজ্যবাদের নিশান বহনকারী। হিন্দু নামাবলি তার পোশাকিরূপ; ভারতবর্ষের বিপ্লবী আঘাত এবং অভিযান থেকে বাঁচার বর্ম। বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা তার সহায়ক। শেখ হাসিনার শাসনামলে তার এক ধরনের পাকা স্বার্থ-সুবিধা ছিল, আবার ২০২৪ সালের গণ অভ্যুত্থান পরবর্তী ভারত বিরোধিতার নামে সাম্প্রদায়িক বিস্তার হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকারের পশ্চিমবঙ্গ দখলে অনেক সুবিধা করেছে।

বুর্জোয়াশ্রেণি এখন সকাল-বিকালের সংকটে রয়েছে। সমাজতন্ত্র এবং বামপন্থিরা নাই নাই বলে রব তুলছে আবার বামপন্থার ভয়ে ভীতও রয়েছে। বুর্জোয়া শাসন আগে বুর্জোয়া বাঙালি জাতীয়তাবাদী বনাম বুর্জোয়া বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী বা বাঙালি জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্রী এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী অগ্রাসন ও যুদ্ধ বন্ধের দাবি

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে দেশের স্বার্থ বিরোধী বাণিজ্য চুক্তি বাতিল কর

গোলটেবিল আলোচনায়

সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবিরোধী জোট

সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবিরোধী জোটের উদ্যোগে ১০ জুন '২৬ জাতীয় প্রেসক্লাবের তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া মিলনায়তনে এক গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। জোটের শীর্ষ নেতা ও বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল আলোচনায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, সিপিডি'র সম্মানীয় ফেলো অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, বিজিএমইএ-র সহসভাপতি ইনামুল হক খান, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও 'চর্চা' নিউজ পোর্টাল এর সম্পাদক জনাব সোহরাব হোসেন, বিসিক এর সাবেক পরিচালক ও প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জনাব আবু তাহের খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক মোশাহিদা সুলতানা। জোটের পক্ষ থেকে সূচনা বক্তব্য পাঠ করেন বাংলাদেশ জাসদের স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. মুশতাক হোসেন।

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, এটা বাণিজ্য চুক্তির নামে বাস্তবে ট্রাম্পের আদেশপত্র। এখানে একতরফা মার্কিন স্বার্থ রক্ষিত হয়েছে। তিনি বলেন, চুক্তি তো হয় দুই পক্ষে, এই চুক্তি দুটি



পক্ষ সাজিয়ে স্বাক্ষর হলেও বাস্তবে তারা উভয়েই এক পক্ষ, মার্কিন স্বার্থ রক্ষার পক্ষের লোক। বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষার কোন লোক ছিল না। এখনও যারা সরকারে আছে এবং বিরোধী দলে বিভক্ত হয়ে আছে সেই বিএনপি, জামায়াত, এনসিপি তারা সংসদে প্রতি মিনিটে ২ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা খরচ করে অপ্রয়োজনীয় অনেক বিষয় নিয়ে হইচই করলেও বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনার ফসরত পাচ্ছে না। এ থেকে বুঝা যায় তারা সবাই মার্কিন স্বার্থ রক্ষায় একমত। জনগণের দাবির প্রতি সম্মান জানিয়ে বিএনপি সরকারকে চুক্তি বাতিল করে প্রমাণ করতে হবে,

‘সবার আগে বাংলাদেশ’—এর পক্ষে তারা।

তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বে বাজার অর্থনীতিরও একটা নিয়ম আছে; চাহিদা অনুযায়ী যেখানে কমদামে পাবে সেখান থেকে পণ্য কিনবে আবার উদ্বৃত্ত পণ্য যেখানে বেশি দাম পাবে সেখান রঙানি করবে। কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসন এর আচরণে দেখা যায় অন্য দেশের জন্য খোলা বাজার নীতি, আমেরিকার জন্য না। তারা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার যে ভারসাম্যের নীতি তারও তোয়াক্কা করছে না। আমেরিকা সারা দুনিয়ায় দস্যুবৃত্তি করে বেড়াচ্ছে। এর বিরুদ্ধে জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সরকারকে

চুক্তি বাতিলে বাধ্য করতে হবে।

ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, চুক্তির নাম দিয়েছে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক বাণিজ্য চুক্তি, বাস্তবে এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে একতরফা চুক্তি। ২০২৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারিতে আমেরিকা বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর নামে একপাক্ষিকভাবে ৫৭ দেশের উপর পাল্টা শুল্ক আরোপ করে। বাংলাদেশও তার মধ্যে রয়েছে। কিন্তু মার্কিনের কোন মিত্র দেশ এই চুক্তি স্বাক্ষর করেনি। ২০ ফেব্রুয়ারি সে দেশের সুপ্রিম কোর্ট শুল্ক আরোপ অবৈধ ঘোষণা করে। এর পর মালয়েশিয়া চুক্তি বাতিল করে। বাংলাদেশসহ মাত্র ৯টি দেশ ওই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। তাও আবার বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শর্ত। বাংলাদেশের মতো আর কোন দেশ নতজানু হয়ে জাতীয় স্বার্থ বিকিয়ে অগ্রহী হয়ে চুক্তি করেনি।

তিনি বলেন, গার্মেন্টস শিল্পে লাভ হবে বলে অনেক কথার ফুলঝুরি থাকলেও বাস্তবে চুক্তি পোশাক শিল্পের জন্য অশনি সংকেত। শ্রমিক বেকার হবে। এই চুক্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চুক্তির করার আগে ধারা শর্ত ঠিক করার জন্য অনেক অর্থনীতিবিদ, বিশেষজ্ঞ, আইনজীবী নিয়োগ করেছিল কিন্তু বাংলাদেশ কারো সাথে কথা বলেনি, গোপনীয়তার অজুহাতে।

মোশাহিদা সুলতানা বলেন, মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট যে শুল্ক আরোপ অবৈধ ঘোষণা করে এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

পোশাকি পরিবর্তন নয়, পরিবর্তন প্রয়োজন মূলে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বনাম বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্রীতে বিন্যস্ত ছিল। এখন বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী বনাম ধর্মাবাদী বা জাতীয়তাবাদী, গণতন্ত্রী ও ধর্মাবাদী ত্রিভুজ সমীকরণে সাজানো হচ্ছে।

যুক্তি, গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের কথা বলা পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদে এসে বার্ষিক্যে পৌঁছেছিল। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সংকটে সে এখন মরণদশার কাছাকাছি। তার মৃত্যুর আগে সভ্যতাকে, মানুষের মানবিক মূল্যবোধ এবং তাদেরও বহু সৃষ্টি ও কীর্তিকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এটা তাঁরা ইচ্ছা করে করছে তা নয়, সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্নিহিত চরিত্র বৈশিষ্ট্যই তাকে সেদিকে নিয়ে যাচ্ছে। এর একমাত্র প্রতিষেধক ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে রাশিয়ায় বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সভ্যতার বহু নতুন সোপান রচিত হয়েছিল কিন্তু শোধানবাদীদের হাতে পড়ে তা বিনষ্ট হয়ে এবং সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটিয়ে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী মহামারিতে দুনিয়াকে এক ভয়ংকর সংকটে ফেলেছে।

সমাজতন্ত্র এক উন্নত অর্থনৈতিক ও মানবিক সমাজ ব্যবস্থা। সমাজতন্ত্র মানুষের সাথে মানুষকে ঘনিষ্ঠ করে, লাভ-লোভের উর্ধ্বে তোলে। পুঁজিবাদ টাকা এবং মুনাফার হিসাবে সম্পর্ক নির্ধারণ করে, মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে। যে কারণে পুঁজিবাদ যত শক্তিশালী হয়েছে ততই সামাজিক দায়, পারিবারিক বন্ধন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সদা জাগ্রত চেতনা সংকীর্ণ স্বার্থবোধে ঢাকা পড়ছে। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী চেতনা আজ উন্মাদনায় বা দঙ্গলবাজিতে (মব) পরিণত হয়েছে। ভিন্ন মতকে যুক্তিতে গ্রহণ কিংবা বর্জন না করে গোষ্ঠী সন্ত্রাসে দমনের চেষ্টা চলছে। চিন্তার শক্তি কী পরিমাণ অবলুপ্ত হয়েছে যে, কবর থেকে লাশ তুলে পোড়ানো হচ্ছে। জাতীয় চেতনা ও আদর্শিক ভাবনাকে সাম্প্রদায়িকতা-আঞ্চলিকতায় পরিণত করা হচ্ছে। স্বার্থপরতা

এবং সহিংসতা হাত ধরাধরি করে চলছে।

সমাজ অভ্যন্তরের ঘটনাগুলো সমাজের সংকটকেই তুলে ধরে। এক মায়ের এক ছেলে বড় আমলা, আরেক ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও এক মেয়ে স্কুল শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও অযত্নে ও একাকীত্বে একলা ঘরে মরে পড়ে ছিল দেহের পচন ধরা অবস্থায়। আরেক নারীর স্বামী ও দুই মেয়ে দীর্ঘদিন কানাডায়। তিনিও একা ফ্লাটে মরে পড়েছিলেন। খবরের কাগজে এ ধরনের দু-চারটি খবর আসলেও একা বাঁচার করালখাসে মূল্যবোধ লালিত হওয়ার ঘটনা অনেক ঘটে চলেছে। পাশাপাশি নারী নির্যাতনের, বিশেষ করে শিশু নির্যাতনের ঘটনাসমূহ বিবেককে পীড়িত করে মনকে অসুস্থ করে চলেছে। ২০ মাসে ধর্ষণ নির্যাতনে নিহত ৬৪৩ শিশু। ৫ বছরে দুই সহস্রাধিক শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। (কালের কণ্ঠ, ২২ মে, ২০২৬) কোথায় চলেছে দেশ, কোথায় চলেছি আমরা। ক্ষমতার রাজনীতি এগুলো উপেক্ষা করে চলছে নামকাওয়াস্তে লোকদেখানো সহানুভূতি প্রকাশ কিংবা প্রদর্শনবাদে।

আমেরিকার লালিত, বাংলাদেশে হঠাৎ উদিত কীর্তিমান ব্যক্তি অন্তর্বর্তী সরকারে বিশেষ স্থান অধিকারী মার্কিন গুটি চালনায় পারদর্শী ড. খলিলুর রহমান শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে ক্ষমতা বিন্যাসে পরামর্শক থেকে নির্বাচনের তিন দিন আগেই বাংলাদেশের স্বার্থ বিরোধী চুক্তি করিয়ে নিয়েছেন বিদায়ী অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান ড. ইউনুস এর ইচ্ছায় ও নতুন সম্ভাব্য ক্ষমতা বিন্যাসের প্রধান দুই পক্ষের সম্মতিতে। বিনিময়ে তিনি নির্বাচিত সরকারের কাঁধে চেপে জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদের সভাপতি পদ বাগিয়েছেন। এতে দেশের সুনাম বৃদ্ধির প্রচারণার আড়ালে জনগণের স্বার্থ হারিয়ে গেছে।

জনগণের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেবার জন্য এখন বিতর্ক তোলা হচ্ছে, চোর খারাপ না বাটপার কিংবা ডাকাত খারাপ। আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার অনুপস্থিত হয়ে যাচ্ছে। এভাবেই পরাস্ত শক্তির ফিরে আসার জায়গা তৈরি হচ্ছে। কিন্তু

একটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, এরা নিজেরা যতই বিতর্ক করুক না কেন সবাই বামপন্থার বিরুদ্ধে, সমাজতন্ত্রের বিপক্ষে। এদের কেউ সমাজতন্ত্র, সেক্যুলারিজমকে সাইনবোর্ড বানাতে চায়, কেউ সংশোধন করতে চায়। আবার কেউ খারিজ করতে চায়। কিন্তু দিনশেষে সবাই মিলে একই সুরে গান গায়।

বামপন্থার বর্তমান দুরবস্থার কারণও আছে। যেমন নামকরা অনেক বামপন্থি নেতাদের ডিগবাজি এবং বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি মোহে আত্মসমর্পণ। এর পাশাপাশি প্রগতিশীল ভেদকারী বুদ্ধিজীবী এবং খ্যাতি পাওয়া তথ্য সমৃদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তিদের সমাজতন্ত্র, মার্কসবাদ, সেক্যুলার ভাবাদর্শকে ঘিরে এলোমেলো চিন্তার জট পাকিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা, অসচেতন নিষ্ঠাবান বাম কর্মীদের মধ্যে হতাশা তৈরি করার পাশাপাশি মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়ার তথ্য আবর্জনার স্তুপ ভারী করা এসব মিলে চলছে বামপন্থার শক্তি ক্ষয়। পারস্পরিক অপ্রয়োজনীয় বাচাল বিতর্কের কারণেও বামপন্থা প্রয়োজনীয় শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে পারছে না।

দেশের মানুষের ওপর আর্থিক ব্যয়ভারের দুঃসহ বোঝা চাপছে ক্রমাগত ভারী হয়ে। শ্রমজীবী, মেহনতি-সর্বহারা তো পরের কথা, নিম্নবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্তরাও চরম টানাটানি দশায় পড়ে গেছে। দুর্নীতি না করে নীতিনিষ্ঠ চাকরির আয়ে সংসার চালানো দায় হয়ে পড়েছে। শাসকশ্রেণিভুক্ত দলগুলি সংকটকালে চোখবুঁজে থেকে তাদেরকে পক্ষপুটে এনে ক্ষমতার হাত বদলের সমাধান বাতলায়। জনপ্রিয় দাবি তুলে বামপন্থি দলগুলোও একই ছাঁচে ও ধাঁচে টিকে থাকতে চাইছে। কিন্তু কার্যকারণ বুঝে এবং তা পরিবর্তনের সংগ্রাম করা, পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও চলমান গতিতে চলা এবং তাকে অতিক্রম করে অগ্রসর হওয়ার সাধনা ও কর্মযোগের ব্যস্তি ঘটানো সময়ের দাবি। প্রধানত দৃষ্টিভঙ্গির দুর্বলতা এবং জনসম্পৃক্ত করার ক্ষমতার অভাবে বামপন্থার পক্ষের বিরাট সুপ্ত শক্তি দূরত্বে থাকছে। এই শক্তি বামপন্থীদের

সাথে কর্মযোগে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে যুক্ত হলে বুর্জোয়াদের হিসাবনিকাশ পালটে দিতে পারে।

একটা তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেছে। আগে গ্রামেগঞ্জে ছদ্মবেশে বুর্জোয়াদের অনুগামী শাসন প্রশাসনের সহায়তাকারীরা গণবিচ্ছিন্ন ছিল। দু-দশ গ্রাম খুঁজলেও দু-চার জনের বেশি বাচাল নীতিহীন থানা প্রশাসনের এজেন্ট, মন্ত্রী এমপিদের ধামাধরা খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল। কারণ প্রত্যক্ষ শ্রম এবং ছোট খাটো কাজকর্মে সার্বক্ষণিক ব্যস্ত থাকার বাইরে পরশ্রমে চলাদের সংখ্যা ছিল কম। এখন বুর্জোয়া রাজনীতি এবং প্রশাসনের শক্তি অনেক বিস্তৃত হওয়ায় পরজীবীদের সংখ্যাও বেড়েছে। এখন গ্রামে হাটেবাজারে চোখে মুখে কথা বলা, যখন যেমন তখন তেমন বলা, বাচাল প্রকৃতির লোক ক্রমবর্ধমান। বামপন্থার শক্তি বিস্তৃত এবং শক্তিশালী থাকলে এ পরিস্থিতি এতটা খারাপের দিকে গড়াতে পারত না। বাচালদের চেয়েও শ্রমজীবীদের শক্তির নৈতিক ও আদর্শিক শক্তির প্রকাশ ঘটতে পারত। লাইব্রেরি-ক্লাব, পাঠাগার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ইত্যাদি চেতনা বিকাশের কর্মকাণ্ডের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে পারত। সংস্কৃতি এবং খেলাধুলার সুস্থ্য বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড মানুষকে স্বস্তি ও মানসিক প্রশান্তি দিতে পারত। মাদকাশক্তি ও কিশোরগ্যাং হওয়ার হাত থেকে কিশোর-তরুণদের রক্ষা করতে পারত। যারা মানুষের চেতনাকে নিম্নগামী করে ক্ষমতায় যেতে এবং থাকতে চায় তাঁরা এসব করবে না। এই দায়িত্ব বামপন্থীদেরই নিতে হবে। তাই আজ উচ্চতর জ্ঞানে বিভ্রান্তি কাটিয়ে বামপন্থার নব জাগরণ ঘটাতে হবে। অর্থনৈতিক সংকট, রাজনৈতিক হতাশা, সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ কাটিয়ে সেটাই আগামীর কাম্য ভবিষ্যৎ রচনা করবে।

এই লক্ষ্যে পরিবর্তন ঘটাতে হবে মূলে। মূল সমস্যা দূর করার সংগ্রামে নামতে হবে। তা না হলে পোশাকি পরিবর্তন সমস্যার সমাধান করবে না।

কমরেড জাহেদুল হক মিলুর ৮ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন

বাস্তবায়নে কমরেড মিলুর অবদান প্রেরণা হয়ে থাকবে

বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সদস্য, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সভাপতি এবং চারপ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র-এর সাবেক সভাপতি কমরেড জাহেদুল হক মিলুর ৮ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ১৪ জুন '২৬ বিকেলে ভ্যানগার্ড মিলনায়তনে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে এবং সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য নিখিল দাসের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় আলোচনা করেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য আব্দুল কুদ্দুস, সদস্য আব্দুর রাজ্জাক, অধ্যক্ষ ওয়াজেদ পারভেজ, শম্পা বসু প্রমুখ।

সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, কমরেড জাহেদুল হক মিলু ছিলেন বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি সংগ্রামের একজন নিবেদিতপ্রাণ সংগঠক, শ্রমিক শ্রেণির অকৃত্রিম বন্ধু। শিক্ষাজীবন থেকে তিনি ছিলেন সংস্কৃতিমনা। ছাত্রজীবনে মুক্তিযুদ্ধের শোষণ-বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার চেতনা



ধারণ করে ৭০-এর দশকে তিনি তৎকালীন দুর্নীতি-দুঃশাসনমূলক শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে জাসদ ছাত্রলীগে যোগ দিয়ে ছাত্র আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন।

পরবর্তীতে ৮০ সালে বাসদ গড়ে উঠলে তিনি শুরুতেই বাসদের সাথে যুক্ত হন এবং ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার লোভ পরিত্যাগ করে জনগণের মুক্তির সংগ্রামকে নিজের জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। শ্রমিকদের মুক্তি হবে শ্রমিকদের নিজেদের সংগঠিত সংগ্রাম আর আদর্শত চেতনার এই শক্তি গড়ে তুলতে কমরেড মিলু সারাজীবন চেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি বুঝছেন, শোষণমুক্ত সমাজ গড়তে হলে প্রয়োজন সংগঠিত শ্রমিক শক্তি ও শ্রেণি-চেতনা।

শ্রমিক আন্দোলনে তাঁর অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মেহনতি মানুষকে সংগঠিত করা এবং তাদের লড়াইয়ের হাতিয়ার হিসেবে দেশব্যাপী বিপ্লবী দল বাসদের সাংগঠনিক ভিত্তি গড়ে তুলতে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি কুড়িগ্রাম জেলায় টেক্সটাইল মিল শ্রমিকদের ইউনিয়ন গড়ে তোলেন। এছাড়াও তিনি ছিলেন মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন, স-মিল শ্রমিক ইউনিয়ন, রিকশা শ্রমিক ইউনিয়ন, হোটেল শ্রমিক ইউনিয়ন ও নির্মাণশ্রমিক ইউনিয়নের উপদেষ্টা। প্রতিটি ইউনিয়ন গঠনের মধ্য দিয়ে তিনি শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের পাশাপাশি রাজনৈতিক চেতনা গড়ে তোলার কাজটি করেছেন, যা ছিল

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সংগ্রামের মূল ভিত্তি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, কমরেড মিলু শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (ক্ষপ)-এর কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পালন করেন এবং বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন (ডব্লিউটিইউ)-এর সঙ্গে যুক্ত থেকে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি গড়ে তুলতেও ভূমিকা রাখেন। আন্তর্জাতিক এই সংহতি ছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের একটি অংশ, তা কমরেড মিলুও গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি ছিলেন কুড়িগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য। এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

২০১৮ সালে সাংগঠনিক কাজে ঢাকা থেকে কুড়িগ্রাম গিয়ে বাসায় ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলে প্রথমে কুড়িগ্রাম সদর হাসপাতালে, সেখান থেকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সর্বশেষ বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালে চিকিৎসার চলা অবস্থায় দীর্ঘ ৩২ দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে ১৩ জুন হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর এই মৃত্যু আমাদের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি, কিন্তু শ্রমিক-শোষিতের মুক্তির পথে তিনি যে সংগ্রাম এগিয়ে নিয়েছেন, তা আমাদের প্রেরণা ও শক্তি-সাহস জোগায়। শোষণ-বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাঁর এই ভূমিকা নিপীড়িত মানুষের পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবে চিরকাল।

শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় সিক্ত কমরেড খালেকুজ্জামান

৮০তম জন্মদিনে প্রিয়জনের মিলনমেলা

একটা ছোটখাট মিলনমেলা যেন বসেছিল কচিকাঁচার মেলা অডিটোরিয়ামে। বয়সের বিবেচনায় শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতি, মধ্য বয়সী, বৃদ্ধ মানুষেরা সবাই একসাথে হয়েছিলেন বিকেলবেলায়। তাদের কেউ রাজনৈতিক সংগ্রামের সহযোদ্ধা, কেউ স্কুল জীবনের সহপাঠী, কেউ মুক্তিযুদ্ধের যোদ্ধা, কেউ জেল জীবনের সাথী, কেউ বা আবার পারিবারিক সম্পর্কে আবদ্ধ, বিরুদ্ধ মতের অনুসারীরাও ছিলেন আর ছিলেন ৮০ বছরের যাপিতজীবনে কত বিচিত্র সম্পর্কের বাঁধনে জড়ানো মানুষেরা। কিন্তু সব সম্পর্ক, বন্ধন ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছিলো তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রাম আর জীবন।

কমরেড খালেকুজ্জামানের ৮০তম জন্মদিন উপলক্ষে অনাড়ম্বর অথচ আন্তরিকতাপূর্ণ অনুষ্ঠান হয়ে গেল ৯ মে, ৩৭-এ কাজী মোতাহার সড়ক সেগুনবাগিচা, কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার মেলা ভবনের চতুর্থ তলায়।

সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে অল্প কথায় সকলেই বললেন খালেকুজ্জামানের সাথে তাদের অতীত স্মৃতির টুকরো টুকরো কথা। ৮০ বছর কেউ একসাথে চলার কথা নয়, তাই স্মৃতি টুকরো টুকরোই হয়। এর কিছু যেমন আনন্দের, কিছু বেদনার, কিছু আবার সংগ্রাম ও সাহসের। তাদের টুকরো স্মৃতিগুলো যেন সুতায় বাঁধা কমরেড খালেকুজ্জামানের জীবন। কিছু গান, আবৃত্তি, ফুল দিয়ে বরণ, মিলে যেন এক আনন্দময় বিকেলে পরিণত হয়েছিল সেই বিকেলটা। কমরেড খালেকুজ্জামান তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরলেন কেমন করে তিনি পৌঁছে গেলেন এই ৮০ বছরের জীবনে। (তাঁর বক্তব্য আমরা পরে প্রকাশ করব)।

বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাবেক সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না, গণফোরামের সভাপতি অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, বাংলাদেশ জাসদের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রধান, সিপিবি'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, নাগরিক ঐক্যের প্রেসিডিয়াম সদস্য দেলোয়ার হোসেন রাজা, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশেরফা মিশু, সিপিবি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য লক্ষ্মীচন্দ্রবর্তী, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সমন্বয়ক ফয়জুল হাকিম লাল, জাতীয় গণফ্রন্টের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়ক রজত হুদা, সোনার বাংলা পার্টির সভাপতি সৈয়দ হারুন আর রশীদ প্রমুখ।

এ ছাড়া এসময় বক্তব্য দেন সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খান, সাংবাদিক আবু সাঈদ খান, বিলসের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ, সাংবাদিক মাসুদ কামাল, সাবেক ছাত্রনেতা নার্গিস বেগম মিনি, ক্যাবের উপদেষ্টা অধ্যাপক সামছুল আলম, এএলআরডি'র নির্বাহী পরিচালক সামছুল হুদা, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল হক মুকুল, চারণের সহসভাপতি কামরুজ্জামান ভূইয়া, জাতীয় কবিতা পরিষদের সভাপতি কবি মোহন রায়হান, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের সাবেক নেতা অ্যাডভোকেট সুলতানা আকতার রুবি, সুইডেন প্রবাসী বামপন্থি সুহৃদ খোরশেদ আহমেদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে খালেকুজ্জামানের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন প্রকৌশলী শম্পা বসু।



সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ঢাকা নগরের কমিটি পরিচিতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত

শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণ বন্ধের দাবি

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ঢাকা নগর শাখার উদ্যোগে ১৩ মে '২৬ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ছাত্র সমাবেশ ও ১৩তম কাউন্সিলে নির্বাচিত কমিটি পরিচিতি অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা মহানগর কমিটির সভাপতি অনিক কুমার দাসের সভাপতিত্বে ও সাংগঠনিক সম্পাদক ইনজামামের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ ঢাকা মহানগরের ইনচার্জ কমরেড নিখিল দাস, ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন, আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক রিনা মুর্মু, তিতুমীর কলেজ শাখার আহ্বায়ক ইয়াসির আরাফাত, মিরপুর থানার সংগঠক দিপ হালদার, ইডেন কলেজের সংগঠক রুবায়েয়া ইসলাম এবং বনানী থানার আহ্বায়ক তাসনুভা ইয়াসমিন। সমাবেশ শেষে শিক্ষার বিভিন্ন দাবিসংবলিত ব্যানার-ফ্যাস্টুন, লাল পতাকা নিয়ে একটি সুসজ্জিত মিছিল প্রেসক্লাবের থেকে গুরু করে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, ছাত্র ফ্রন্ট জন্মলগ্ন থেকেই সর্বজনীন, বিজ্ঞানভিত্তিক, সেকুলার, বৈষম্যহীন ও একই ধারার শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে আসছে। সংগঠনটি শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে সংগ্রাম করছে। কিন্তু বারবার শাসকের পরিবর্তন ঘটলেও শিক্ষাব্যবস্থার বৈষম্য



দূর হচ্ছে না; বরং শিক্ষার সংকট ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরদিকে ঢাকা শহরে শিশু-কিশোরদের খেলাধুলার জন্য পর্যাপ্ত মাঠ নেই, এলাকায় এলাকায় শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠাগারও গড়ে ওঠেনি। ফলে পাড়ামহল্লায় কিশোর গ্যাং তৈরি হচ্ছে। স্কুলগুলোতে মিড-ডে মিল চালুর দাবি থাকা সত্ত্বেও শাসকশ্রেণি তা বাস্তবায়ন না করে বরং শিক্ষার্থীদের গাইড ও কোচিংনির্ভর করে তুলছে। এতে শিক্ষার মৌলিক আকাঙ্ক্ষা ব্যাহত হচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, বিগত সরকারগুলো শিক্ষাখাতে বরাদ্দ না বাড়িয়ে বরং বেসরকারি শিক্ষাকে মূলধারার শিক্ষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে। উচ্চশিক্ষা সংকোচনের অংশ হিসেবে ঢাকা সেন্ট্রাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন কমানো হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের পরিবারগুলোকে শিক্ষাব্যয়ের ৭১ শতাংশ বহন করতে হয়। ফলে প্রতিবছর শিক্ষার্থী বারে পড়ার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাজীবন

থেকে বারে পড়ছে, তাদের বারে পড়া রোধ করতে রাষ্ট্রের কোনো কার্যকর ভাবনা নেই। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, আর সেই মেরুদণ্ডকে টিকিয়ে রাখেন শিক্ষকরা। অথচ তাদের বেতন ও সুযোগসুবিধা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ফলে শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে মনোযোগী হতে পারেন না এবং সংসারের ব্যয় নির্বাহের জন্য টিউশনসহ ভিন্ন পেশার ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হন।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, আওয়ামী ফ্যাসিস্ট আমল হোক কিংবা ড. ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার বর্তমান নির্বাচিত বিএনপি সরকার—কেউই শিক্ষার সংকট নিরসনে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করছে না। অন্যদিকে ভিটামিন-এ ও হামের টিকা প্রদানে অবহেলার কারণে পাঁচ শতাধিক শিশুর মৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু সরকার এ বিষয়ে নীরব ভূমিকা পালন করছে। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট গণতান্ত্রিক ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার দাবিতে বিভিন্ন ক্যাম্পাসে আন্দোলন করছে। কিন্তু

একটি চিহ্নিত মৌলবাদী ছাত্র সংগঠন সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানার ব্যবহার করে ছাত্র সমাজের রাজনীতি করা, মত প্রকাশের সাংবিধানিক অধিকার হরণ করে ক্যাম্পাসে বিরাজনীতির পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করছে। বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতাসীন ছাত্রসংগঠনের হল দখল, চাঁদাবাজি ও তোলাবাজিকে ছাত্ররাজনীতি হিসেবে দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ সন্তোষ নির্ভর আদর্শহীন ছাত্র রাজনীতির কিংবা বিরাজনীতির বিরুদ্ধে আদর্শবাদী ছাত্ররাজনীতি গড়ে তোলার আহ্বান জানান। নেতৃবৃন্দ জাতীয় নির্বাচনের ৩ দিন পূর্বে আমেরিকার সাথে তৎকালীন অন্তর্বর্তী সরকারের দাসত্বের বাণিজ্য চুক্তি বাতিলের জোর দাবি জানান।

সমাবেশ শেষে সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন ১৩তম কাউন্সিলে নির্বাচিত সভাপতি অনিক কুমার দাস, সহসভাপতি ইয়াসির আরাফাত, সাধারণ সম্পাদক ইনজামামুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক দিপ হালদারসহ ১৪ সদস্যবিশিষ্ট নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেন।

দপ্তর সম্পাদক : সোহেল রানা; অর্থ সম্পাদক : রুবায়েয়া ইসলাম; প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক : তাসনোভা ইয়াসমিন; পাঠাগার সম্পাদক : প্রজ্ঞা দীপাশ্বিতা পিউ; স্কুল সম্পাদক : নুসরাত আফরিন;

সদস্য : মালিহা নাবিলা নাওয়াল, ইমরান হোসেন, মাস্টা জাহান লিমা, ফয়সাল আহমেদ, শিমলা সরকার।

বন্ধ কলকারখানা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় চালু করতে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ দাও

শ্রমিকদের জন্য রেশন, চিকিৎসা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি

শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ-স্কপ

শ্রমজীবীদের জন্য কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখার দাবিতে ২০ মে যুগ্ম সমন্বয়ক নুরুল আমিনের সভাপতিত্বে এবং ফয়েজ হোসেন এর পরিচালনায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ করে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ-স্কপ। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, স্কপ নেতা আনোয়ার হোসেন, আবদুল কাদের হাওলাদার, চৌধুরী আশিকুল আলম, সাইফুজ্জামান বাদশা, শামীম আরা, সাকিল আক্তার চৌধুরী, আহসান হাবিব বুলবুল, মোকাদ্দেম হোসেন, শহিদুল্লাহ বাদল, রফিকুল ইসলাম, কাজী রুহুল আমিন প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, আগামী ১১ জুন সরকার ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের জন্য ৯ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকার বাজেট প্রণয়ন করবে যা বিগত বছরের বাজেটের তুলনায় প্রায় দেড় লক্ষ কোটি টাকা বেশি। বিগত সরকারের সময় কর্মশূন্য বড় বাজেটের অভিজ্ঞতায় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিসংখ্যানের বিপরীতে শ্রমজীবীদের প্রাপ্তি দারিদ্র্য বৃদ্ধি। শ্রমজীবীদের এই বঞ্চনার বিস্ফোরণ হলো ২৪ এর গণ অভ্যুত্থান। শ্রমজীবীদের রক্তের বিনিময়ে পরিণতি লাভের অভ্যুত্থান পরবর্তীতে নির্বাচিত সরকারের কাছে শ্রমজীবী মানুষের প্রত্যাশার দাবি জানাতেই আজকের এই সমাবেশ ও স্মারকলিপি প্রদানের কর্মসূচি।

মুষ্টিমেয় ধনীদের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হওয়ার পরিবর্তে শ্রমজীবী মানুষের খাদ্য, চিকিৎসা, স্বাস্থ্যকর আবাসন, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মতো প্রয়োজনীয় বরাদ্দ আসন্ন বাজেটে করার দাবি এই সমাবেশ জানাচ্ছে।



একই সাথে মুদ্রাস্ফীতির নিয়ন্ত্রণ এবং অতিরিক্ত মুদ্রাস্ফীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমজীবীদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশনা আসন্ন বাজেটে থাকবে বলে প্রত্যাশা করছে। পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার জন্য কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন এবং বন্ধ কলকারখানা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে আধুনিকায়ন ও পরিচালনার জন্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখার দাবি জানাচ্ছে।

সমাবেশ শেষে একটি সংক্ষিপ্ত মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল শেষে ফয়েজ হোসেনের নেতৃত্বে একটি টিম শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি প্রদান করেন।

স্মারকলিপির বক্তব্য :

গণ অভ্যুত্থান পরবর্তীতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গঠিত সরকারের মন্ত্রী হিসেবে আপনার নিকট শ্রমজীবী মানুষের বিপুল প্রত্যাশা। আপনি জানেন যে, বাংলাদেশের সাত কোটি ৬৫ লাখ শ্রমিকের জীবন কীভাবে কাটছে। মজুরি বঞ্চনা, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, কলকারখানা বন্ধ করে দেওয়া এবং বেকারত্ব বর্তমানে শ্রমিকদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে।

মাননীয় মন্ত্রী,

আপনি জানেন, বাংলাদেশের পাট ও চিনি

শিল্প অর্থনীতির অন্যতম প্রধান খাত। পাট উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয়। একদিকে দেশেই পাটজাত দ্রব্যের বিপুল চাহিদা রয়েছে অন্যদিকে বিশ্ববাজারে রপ্তানির জন্য সুযোগ আছে। বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পাটের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের পরামর্শে এবং ভুলনীতি, দুর্নীতি ও অপচয় রোধ না করে লোকসানের অপবাদ দিয়ে আদমজীসহ দেশের রাষ্ট্রীয় পাটকলগুলো স্বাধীনতা-উত্তর বিভিন্ন সরকারের আমলে একের পর এক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সর্বশেষ বিগত সরকার এক ঘোষণায় ২৫টি রাষ্ট্রীয় পাটকল এবং ৬টি চিনিকল বন্ধ করে দিয়ে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারীকে শুধু পথে বসিয়েছে তাই নয়; সভাবনাময় শিল্পকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। আমরা শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে কীভাবে আধুনিকায়ন করে এই শিল্পকে লাভজনক করা যায় তার হিসাব দিয়ে যুক্তি উত্থাপন করেছিলাম। কিন্তু আমাদের কথা এবং দেশের অর্থনীতিকে তাঁরা বিবেচনায় নেয়নি। কলমের এক খোঁচায় সব বন্ধ করে দিয়েছিল।

বাংলাদেশের শ্রমিক কর্মচারীরা আশায় বুক

বেধেছিল যখন আপনারা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে বন্ধ কলকারখানা চালু করার কথা বলেছিলেন। শ্রম মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী হিসেবে তাই আপনার মাধ্যমে সরকারের কাছে আমরা আমাদের প্রত্যাশা তুলে ধরছি। আমাদের আশা, আপনি লাভজনক দেশীয় শিল্প এবং অতীত ঐতিহ্যের কথা বিবেচনা করে বন্ধ করে দেওয়া পাট ও চিনিকলগুলো রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে আধুনিকায়ন করে চালু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

মাননীয় মন্ত্রী, আর একটি বিষয়ে আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা কারণে দেশের বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ঘটনা ঘটেই চলেছে। কিন্তু বাজার দরের সাথে সঙ্গতি রেখে সীমিত আয়ের শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি হচ্ছে না। ফলে শ্রমিকদের জীবনযাপন কঠিন হয়ে পড়ছে। এর ভয়াবহ ফলাফল হিসেবে শ্রমিক ও তার সন্তানরা অপুষ্টিতে ভুগছে এবং শিশুদের মানসম্পন্ন শিক্ষা অর্জন করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। উৎপাদনের চাকা ঘোরে শ্রমিকের শ্রমে, প্রবৃদ্ধি বাড়ে, রপ্তানি আয় বাড়ে যে শ্রমিকের শ্রমের কারণে সেই শ্রমিক এবং তার পরিবারের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য রেশনে সুলভ মূল্যে খাদ্য পণ্য সরবরাহের দাবি আমাদের দীর্ঘদিনের। এবারের বাজেটে তাই শ্রমিকের রেশন-আবাসন, পেনশন ও চিকিৎসার জন্য বিশেষ বরাদ্দের উদ্যোগ নেওয়া হবে এটা আমাদের ঐকান্তিক প্রত্যাশা।

দীর্ঘদিনের বৈষম্য এবং দুর্নীতি দূর করার আকাঙ্ক্ষা থেকেই শ্রমিকরা গণ অভ্যুত্থানে অংশ নিয়েছিলো, সবচেয়ে বেশি জীবন দিয়েছিলো, পঙ্গুত্ববরণ করেছিলো। অভ্যুত্থান পরবর্তী সরকারের কাছে তাই শ্রমিকদের প্রত্যাশা অনেক। আমরা আশাকরি আপনি বাজেটে শ্রমিকদের জন্য বিশেষ বরাদ্দ করা এবং বন্ধ সকল রাষ্ট্রীয় কলকারখানা আধুনিকায়ন করে চালু করার উদ্যোগ নেবেন। এর ফলে শিল্পের বিকাশ ঘটবে এবং শ্রমিকের জীবনমানের উন্নতি হবে। এক্ষেত্রে আমরা আপনার কার্যকর উদ্যোগ প্রত্যাশা করি।

বাসদ নেতা মজিবুর রহমান ফরিদের মৃত্যুতে শোক



বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ১৭ জুন '২৬ গণমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে বাসদ হবিগঞ্জ জেলা কমিটির সদস্য ও চুনরুঘাট উপজেলা শাখার সদস্যসচিব কমরেড মজিবুর রহমান ফরিদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার-

পরিজন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, রাজনৈতিক সহকর্মীসহ সকলের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, কমরেড মজিবুর রহমান ফরিদ ১৫ জুন চুনরুঘাটের নিজ বাসভবনে অবস্থানকালে বৃকে ব্যাথা অনুভব করলে ওই দিন রাতে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে চুনরুঘাট থেকে রওনা হয়ে ১৬ জুন বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালের (সাবেক পিজি হাসপাতাল) হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. দিপাল কৃষ্ণ অধিকারীর অধিনে ভর্তি হয়। ভর্তির পর সারাদিন বেশ হাসিখুশিভাবে কাটাতেও রাতে হঠাৎ বৃকে ব্যাথা ও শ্বাসকষ্ট শুরু হয় এবং ১৭ জুন রাত ২:১০ মিনিটে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর মরদেহ হাসপাতাল থেকে এ্যাম্বুলেন্সে করে ভোর ৪টায় কমরেড ফরিদের প্রিয় পার্টি অফিস ২৩/২ তোপখানা রোডস্থ বাসদ ভবনের সামনে আনা হয়। সেখানে বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা কমরেড খালেদুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য কমরেড নিখিল দাস, আব্দুল কুদ্দুস, জনার্দন দত্ত নান্টু, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড

আব্দুর রাজ্জাক, অধ্যক্ষ ওয়াজেদ পারভেজ, সাইফুল ইসলাম পল্টু, নব কুমার কর্মকার, জুলফিকার আলী, শফিউর রহমান, ডা. মনীষা চক্রবর্তী, কেন্দ্রীয় বর্ধিত ফোরামের সদস্য গোলাম রব্বানী, জয়নাল আবেদীন মুকুল, আল কাদেরী জয়, মাইনউদ্দিন চৌধুরী, আনোয়ারুল ইসলাম, হবিগঞ্জ জেলা বাসদের সদস্যসচিব শফিকুল ইসলাম, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন, ছাত্র ফ্রন্টের নেতা সুলতানা আকতার, অনীক কুমার দাস, হারুন অর রশীদসহ পার্টির নেতা কর্মীরা প্রিয় কমরেডের মরদেহে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়। তার আগে কমরেড ফরিদের মরদেহ পার্টির রক্ত পতাকা দিয়ে আবৃত করা হয়।

কমরেড ফরিদ স্কুল জীবনে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ও বাসদের রাজনৈতিক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হন। তার ধারাবাহিকতায় গাজীপুর, চুনরুঘাট ও হবিগঞ্জে ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং বাসদ হবিগঞ্জ জেলার সমন্বয়কের দায়িত্বও পালন করেছেন। তিনি হবিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্থানে কৃষক-শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ভূমিকা রেখেছেন। চা-শ্রমিকদের সংগঠিত করে দাবি আদায়ের আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন। বিশেষ

করে চুনরুঘাটের গাজীপুর অঞ্চলের স্থানীয় সমস্যা সংকট নিরসনে তিনি সর্বদায় সোচ্চার ছিলেন। তিনি যে কোনো অন্যায-অত্যাচার, জুলুম-নির্যাতন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর, সাহসী ও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হিসেবে এলাকায় পরিচিত ছিলেন। তিনি দেশের সম্পদ রক্ষায় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এবং দেশের তেল-গ্যাস, বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষার আন্দোলনে জেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থা ভেঙে কৃষক-শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে শোষণমুক্ত, বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণের আকাঙ্ক্ষায় সারা জীবন লড়াইয়ের ময়দানে ছিলেন। তাঁর প্রয়াণে দল একজন নিবেদিতপ্রাণ, দৃঢ়চিত্তের লড়াকু কমরেডকে হারাল; এলাকাবাসী হারালেন একজন অন্যায়ের প্রতিবাদী সাহসী মানুষকে; পরিবার হারিয়েছে অভিভাবককে।

কমরেড ফরিদের বিপ্লবী জীবনের সংগ্রাম, দায়িত্বশীলতা ও আদর্শিক চেতনা, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য আগামী দিনে কৃষক-শ্রমিক, মেহনতি মানুষের শোষণমুক্ত, বৈষম্যহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের আন্দোলনে অনুপ্রেরণা জোগাবে। কমরেড মজিবুর রহমান ফরিদ, লাল সালাম !

লেনিন স্মরণে : লেনিন ছিলেন আমাদের পার্টির পাহাড়ি ঈগল—জে ভি স্ট্যালিন



ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ লেনিন : জন্ম ২২ এপ্রিল ১৮৭০; মৃত্যু : ২১ জানুয়ারি ১৯২৪। ২২ এপ্রিল ২০২৬ ছিল লেনিনের ১৫৬তম জন্মবার্ষিকী। ১৯২৪ সালের ২৮ জানুয়ারি ক্রেমলিন মিলিটারি স্কুলে লেনিনের স্মরণে দেওয়া কমরেড স্ট্যালিনের একটি অসামান্য ভাষণ, যা পাঠককে লেনিনের জীবন সংগ্রাম বুঝতে সহায়তা করবে। আমরা সেই ভাষণটি প্রকাশ করছি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসাবে। দুই পর্বের লেখা—এখানে শেষপর্ব। সম্পাদক।

...কিন্তু লেনিন কখনই সংখ্যাগরিষ্ঠতার জালে বন্দি হয়ে পড়েননি, বিশেষ করে যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নীতিভিত্তিক নয়। আমাদের পার্টির ইতিহাসে এমন অনেক সময়ই ঘটেছে যে, সর্বহারার মৌলিক স্বার্থের সঙ্গে আমাদের দলের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত বা দলের আশু স্বার্থের বিরোধ দেখা দিয়েছে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের বিরুদ্ধে গিয়েও মূল আদর্শের (প্রিন্সিপল) সমর্থনে অবিচল হয়ে দাঁড়াতে লেনিন কখনও দ্বিধা করেননি। এমনকি এ সমস্ত ক্ষেত্রে অন্যান্য সকলের বিরুদ্ধে একা দাঁড়িয়ে থাকতেও তিনি ভীত ছিলেন না। কারণ, তিনি অনেক সময়ই বলতেন, ‘যে নীতি (পলিসি) আদর্শের ভিত্তিতে (প্রিন্সিপল) রচিত, সেটাই একমাত্র সঠিক নীতি।’ এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে দুটি ঘটনার কথা বলা যায়। প্রথম ঘটনা হচ্ছে ১৯০৯-১১ সময়কালের, যখন আমাদের দল প্রতিবিপ্লবের আঘাতে চূর্ণ হয়েছিল এবং পুরোপুরি ভেঙে যাওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়েছিল। এ সময়টায় দলের মধ্যে অবিশ্বাস মাথাচাড়া দিয়েছিল। শুধু বুদ্ধিজীবীরা নয়, শ্রমিকরাও ব্যাপক হারে দলত্যাগ করছিল। ওই সময়ে বেআইনি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা হচ্ছিল, তা ছিল দলের বিলোপ ও পুরোপুরি ভাঙনের সময়। শুধু মেনশেভিকরা নয়, সে সময় এমনকি বলশেভিকরাও ছিল একাধিকগোষ্ঠী ও নানা প্রবণতার সমষ্টি এবং শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলন থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। আপনারা জানেন, ঠিক ওই সময়টাতেই এই ধারণা মাথাচাড়া দিয়েছিল যে, বেআইনি সংগঠনকে পুরোপুরি বিলোপ করতে হবে এবং স্টলিপিন পার্টির মতো একটা উদারবাদী পার্টিতে সংগঠিত করতে হবে শ্রমিকদের। এই ধারণা ব্যাপক মড়কের মতো ছড়িয়েছিল। একমাত্র লেনিনই ছিলেন সেই নেতা যিনি এই ধারণার কাছে মাথা নত করেননি এবং পার্টির আদর্শের পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে রেখেছিলেন।

বিস্ময়কর ধৈর্য এবং অসাধারণ অধ্যবসায়ে তিনিই শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে পার্টিবিরোধী

প্রতিটি প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই করে দলের ছড়িয়েছিটিয়ে পড়া শক্তিকে সমবেত করেছিলেন এবং অসাধারণ সাহস ও অতুলনীয় সহ্যশক্তি নিয়ে পার্টির আদর্শকে রক্ষা করেছিলেন। আমরা জানি, পার্টির আদর্শ রক্ষার এই লড়াইয়ে লেনিনই পরে বিজয়ী প্রমাণিত হন।

দ্বিতীয় ঘটনা হচ্ছে ১৯১৪-১৭ সালের সময়কার। ওই সময়ে পুরোদমে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চলছিল। তখন সমস্ত বা বলা যায় প্রায় সমস্ত সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক বা সোস্যালিস্ট পার্টিগুলো, সাধারণভাবে দেশপ্রেমের যে জিগির ওঠেছিল, তার কাছে আত্মসমর্পণ করে বসেছিল এবং নিজ নিজ দেশে সাম্রাজ্যবাদের সেবায় নিজেদের সঁপে দিয়েছিল। এটা ছিল এমন একটা সময় যখন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের পায়ে আত্মসমর্পণ করেছিল, যখন প্রোখানভ, কাউটস্কি, জুল গেদ (Jules Guesde) এবং অন্যান্যরা উগ্র জাতিদ্বন্ডের জোয়ারে ভেসে গিয়েছিলেন। লেনিন সে সময় ছিলেন একা। বলা যায়, প্রায় একমাত্র নেতা যিনি উগ্র জাতীয়তাবাদী সমাজমানসিকতার বিরুদ্ধে, তথাকথিত ‘শান্তি শান্তি’ বুলির বিরুদ্ধে (সোস্যাল ফ্যাসিফিজম) সুদৃঢ় সংগ্রাম শুরু করেন, জুল গেদ-দের এবং কাউটস্কিদের বিশ্বাসঘাতকতাকে তীব্র খিকার জানান এবং যে সব ‘বিপ্লবী’রা—ঘরেও নয় পারেও নয় অবস্থান নিয়ে চলছিল, তাদের স্বরূপ খুলে দেন। লেনিন জানতেন, তাঁর পিছনে সমর্থন বলতে রয়েছে অত্যন্ত ক্ষুদ্র এক অংশের। কিন্তু তাঁর কাছে এটা প্রধান বিবেচ্য বিষয়ই ছিল না। কারণ তিনি জানতেন, একমাত্র সঠিক নীতি, যে নীতির ভবিষ্যৎ আছে, তা হচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন আন্তর্জাতিকতাবাদ। আমরা জানি, একটি নতুন আন্তর্জাতিক গড়ে তোলার এই সংগ্রামেও লেনিন বিজয়ী প্রমাণিত হন। ‘মূল আদর্শভিত্তিক একটি নীতিই হচ্ছে সঠিক নীতি’—এই প্রত্যয়কে হাতিয়ার করেই নতুন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে লেনিন নতুন ‘দুর্ভেদ্য’ অবস্থান নিয়ে দাঁড়ান এবং সর্বহারার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের বিপ্লবী মার্কসবাদের পক্ষে জয় করে আনেন।

জনগণের উপর আস্থা

তত্ত্ববিদরা ও বিভিন্ন দলের নেতারা যাঁরা বিভিন্ন জাতির ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত এবং বিপ্লবগুলির ইতিহাস শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অধ্যয়ন করেছেন, তাঁরাও অনেক সময় একটা লজ্জাজনক রোগে আক্রান্ত হন। রোগটা হলো জনগণকে ভয় পাওয়া, জনসাধারণের সৃজনশীল ক্ষমতার প্রতি অবিশ্বাস। এই রোগই নেতাদের মধ্যে জনগণ থেকে নিজেদের উঁচুতে ভাবার একটা অভিজাতসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়। কিন্তু বিপ্লবের ইতিহাস রঙ না হলেও এই জনগণের উপরেই ন্যস্ত রয়েছে পুরনো ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে নতুন ব্যবস্থা গড়ার ইতিহাস অর্পিত দায়িত্ব। এই অভিজাতসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির পিছনে রয়েছে এই ভয় যে, জনগণ লাগামছাড়া হয়ে যেতে পারে, ‘বড় বেশি ধ্বংস করে ফেলতে পারে’; এর পিছনে রয়েছে এই বাসনা যে তাঁরা হবেন জনগণের শিক্ষাগুরু, তাঁরা বই পড়ে জনগণকে শিক্ষা দেবেন, কিন্তু নিজেরা জনগণের কাছ থেকে শিখবেন না।

লেনিন ছিলেন এই সমস্ত নেতাদের ঠিক বিপরীত। সর্বহারাশ্রেণির সৃজনশীল ক্ষমতায় এবং তাদের শ্রেণিবোধের বৈপ্লবিক কার্যকারিতায় এত গভীর আস্থা লেনিনের মতো আর কোনও বিপ্লবীর ছিল কি না, আমি জানি না। ‘বিপ্লবের অরাজকতা’ এবং ‘জনগণের অবৈধ কার্যকলাপের দাঙ্গাহাঙ্গামা’ ইত্যাদি বলে যে সব আত্মতৃপ্ত ভদ্রলোক সমালোচনায় মুখর হতেন, তাঁদের

লেনিন যেভাবে নির্দয় কশাঘাত করেছেন, তা আর কোনও বিপ্লবী করতে পেরেছেন বলে আমার জানা নেই। আমার মনে পড়ে, কোনও এক আলোচনার সময় একজন কমরেড বলেছিলেন, ‘বিপ্লবের পর পরই শৃঙ্খলা ফিরে আসা উচিত।’ লেনিন জবাবে শ্লোষের সঙ্গে বলেছিলেন, ‘খুব দুঃখের কথা যে, যারা বিপ্লবী হতে চায়, তারা ভুলে যায় যে, বিপ্লবের পরিস্থিতিই হলো ইতিহাসের সবচেয়ে আদর্শ শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিস্থিতি।’ এজন্যই যারা জনগণকে ওপর ওপর বিচার করে এবং তাদের বই পড়ে শেখাতে চায়, তাদের প্রতি লেনিনের এত অশ্রদ্ধা ছিল। তাই লেনিন নিরন্তর বলতেন, জনগণ থেকে শেখো। তাদের ক্রিয়াকর্মকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করো। জনগণের সংগ্রামের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করো। জনগণের সৃজনশীল ক্ষমতার প্রতি আস্থা লেনিনের ক্রিয়াকর্মের এটা ছিল বৈশিষ্ট্য, যা তাকে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বুঝতে এবং তাদের আন্দোলনকে সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলনের খাতে পরিচালিত করতে সক্ষম করেছিল।

বিপ্লবের প্রতিভা

লেনিন বিপ্লবের জন্যই জন্ম নিয়েছিলেন। বৈপ্লবিক বিক্ষোভ ঘটানোর ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন যথার্থই জিনিয়াস এবং বিপ্লবী নেতৃত্ব দেওয়ার শিল্পে সর্বোত্তম দক্ষতার অধিকারী। বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সময় তিনি যেমন চিন্তামুক্ত ও আনন্দিত থাকতেন, তেমনটা আর কখনও নয়। আমার এ কথার অর্থ এ নয় যে, সমস্ত রকম বিপ্লবী অভ্যুত্থানকেই লেনিন সমর্থন করতেন বা যে কোনও সময়ে যে কোনও পরিস্থিতিতেই বিপ্লবী বিক্ষোভের পক্ষে ছিলেন তিনি। কখনওই তা নয়। আমি যা বলতে চাই, তা হলো, বিপ্লবী বিক্ষোভের সময় লেনিনের অন্তর্দৃষ্টির প্রতিভার বিচ্ছুরণ পূর্ণ ও স্পষ্টভাবে দেখা যেত। বিপ্লবের সময় আক্ষরিক অর্থেই লেনিন যেন আরও বেশি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতেন, সুদূরের দৃষ্টা হয়ে উঠতেন, শ্রেণিগুলির গতিপ্রকৃতি ও বিপ্লবের আঁকাবাঁকা পথ হাতের তালুর মতো দেখতে পেতেন। ফলে সঙ্গত কারণেই আমাদের দলের মধ্যে এই কথাটা চলত যে, ‘জলে মাছের মতোই লেনিন বিপ্লবের জোয়ারে সাঁতার কাটেন’। এর থেকেই এসেছিল লেনিনের কৌশলগত স্লোগানগুলোর ‘বিস্ময়কর’ স্বচ্ছতা এবং তাঁর বৈপ্লবিক পরিকল্পনাগুলোর ‘হতবাক করা’ সাহসিকতা। লেনিনের এই বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আমার দুটো বিশেষ ঘটনার কথা মনে পড়ছে।

প্রথম ঘটনা হচ্ছে অক্টোবর বিপ্লবের ঠিক পূর্ববর্তী সময়ের। এ সময় লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, চাষি ও সেনারা যুদ্ধক্ষেত্রে এবং পিছনে দেশের মধ্যে সংকটে সংকটে জীর্ণ হয়ে শান্তি এবং স্বাধীনতা দাবি করছিল। এ সময় সেনাধ্যক্ষরা ও বুর্জোয়াশ্রেণি ‘খতমের যুদ্ধ’ চালিয়ে যাওয়ার জন্য একটা সামরিক একনায়কত্ব কায়েমের পরিকল্পনা করছিল। তথাকথিত সমগ্র ‘জনমত’ এবং তথাকথিত সমস্ত ‘সোস্যালিস্ট দলগুলো’ বলশেভিকদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়িয়ে তাদের ‘জার্মানির গুপ্তচর’ বলে প্রচার করছিল। কেরেনস্কি চেষ্টা করছিল বলশেভিক পার্টিকে আভারখাউন্ডে ঠেলে দিতে এবং কিছুটা সফলও হয়েছিল। অস্ট্রো-জার্মান জোট তখনও শক্তিশালী ও শৃঙ্খলাবদ্ধ সেনাবাহিনী নিয়ে আমাদের বিধবস্ত ও বিপর্যস্ত সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করছিল। পশ্চিম ইউরোপের ‘সোস্যালিস্টরা’ তাদের সরকারগুলোর সাথে যুদ্ধে ‘পূর্ণ বিজয়ের জন্য’ আনন্দময়ী আঁতাতের মধ্যে ছিল। ... ঠিক সেই সময় একটা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান শুরু করার অর্থ কী হতে পারে? এইরকম পরিস্থিতিতে

তার অর্থ ছিল সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নেওয়া। কিন্তু লেনিন সেই ঝুঁকি নিতে ভয় করেননি। কারণ তিনি জানতেন যে, তিনি পরিস্থিতিকে দেখছেন একজন দৃষ্টার চোখ নিয়ে, একটা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান অনিবার্য এবং তা জয়ী হবে। রাশিয়ায় একটা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সমাপ্তির পথ প্রশস্ত করবে, পশ্চিমের যুদ্ধবিধবস্ত জনগণকে তা উদ্দীপ্ত করবে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করবে। এই অভ্যুত্থান রিপাবলিক অফ সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের জন্ম দেবে এবং সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র সমগ্র বিশ্বের বিপ্লবের দুর্গ হিসাবে কাজ করবে। আমরা জানি, লেনিনের এই বৈপ্লবিক দূরদৃষ্টি পরবর্তীকালে অতুলনীয় নির্ভুলতায় সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় ঘটনা হচ্ছে, অক্টোবর বিপ্লবের প্রথম দিককার, যখন বিদ্রোহী কম্যান্ডার জেনারেল দুখোনিংকে শত্রুতা বন্ধ করার জন্য এবং জার্মানদের সঙ্গে অস্ত্র সংবরণের আলোচনা শুরু করার জন্য বাধ্য করতে কাউন্সিল অব পিপলস কমিশার্স চেষ্টা চালাচ্ছিল।

আমার মনে পড়ে যে, লেনিন, ক্রাইলেক্সো (ভবিষ্যতের কম্যান্ডার ইন চিফ) এবং আমি পেট্রোগ্রাডে সেনা হেড কোয়ার্টারে যাই সরাসরি টেলিফোনে দুখোনিংয়ের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য। এটা ছিল ভয়ঙ্কর সময়। দুখোনিং ও ফিল্ড হেড কোয়ার্টারের অফিসাররা কাউন্সিল অব পিপলস কমিশার্সের আদেশ মানতে সরাসরি অস্বীকার করল। সেনা অফিসাররা ছিল ফিল্ড হেডকোয়ার্টারের সম্পূর্ণ প্রভাবাধীন। সাধারণ সেনারা কী করবে, তাও বলা দুঃসাধ্য ছিল, কারণ যে সব তথাকথিত সেনা সংগঠনের সদস্য ছিল তারা, সেগুলি সবই ছিল সোভিয়েট শক্তির বিরোধী। খোদ পেট্রোগ্রাডে আমরা জানি, মিলিটারি ক্যাডেটদের একটা বিদ্রোহ দানা বাঁধছিল। তার ওপর, পেট্রোগ্রাড দখল করে বসেছিল কেরেনস্কি। আমার মনে পড়ে, সরাসরি ফোনে কথা বলার সময়ে একটু থামতেই দেখলাম লেনিনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পরিকার বোঝা গেল, তিনি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। তিনি বললেন, ‘চলুন, আমরা ওয়্যারলেস স্টেশনে যাই। এরা আমাদের পক্ষে দাঁড়াবে। জেনারেল দুখোনিংকে বরখাস্ত করে এবং কমরেড ক্রাইলেক্সোকে নতুন কম্যান্ডার ইন চিফ করে আমরা একটা বিশেষ আদেশ জারি করব এবং অফিসারদের এড়িয়ে সেনাদের কাছে সরাসরি আবেদন জানাব— সেনা অফিসারদের ঘেরাও করো, যুদ্ধ বন্ধ করো, অস্ট্রো-জার্মান সৈন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করো এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায়কে নিজেদের হাতে তুলে নাও।’

এটা ছিল ‘অন্ধকারে বাঁপ দেওয়া’। কিন্তু লেনিন এই ‘বাঁপ’ থেকে বিরত হলেন না, বরং বাঁপ দিতে ব্যগ্র হলেন। কারণ তিনি জানতেন, সেনারা শান্তি চাইছিল এবং পথের সমস্ত বাধা বিদেয় করে তারা শান্তি জয় করে আনবে। তিনি জানতেন, শান্তি প্রতিষ্ঠার এই পদ্ধতি অস্ট্রো-জার্মান সৈন্যদের উপর প্রভাব ফেলতে বাধ্য এবং সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রে শান্তির জন্য যে কামনা, তাকেই এই পদ্ধতি উৎসাহিত করবে। আমরা জানি, এ ক্ষেত্রেও লেনিনের বৈপ্লবিক দূরদৃষ্টি পরবর্তীকালে নিখুঁতভাবে সঠিক প্রমাণ হয়েছিল। একজন প্রতিভাবানের অন্তর্দৃষ্টি আসন্ন ঘটনাবলির ভিতরকার ক্রিয়াকর্মকে অত্যন্ত দ্রুত বুঝতে পারার ক্ষমতা—এই ছিল লেনিনের গুণ। এটাই তাঁকে সঠিক রণনীতি নিরূপণ করতে এবং বিপ্লবী আন্দোলনের আঁকাবাঁকা পথে সঠিক ভূমিকা নির্ধারণ করতে সক্ষম করেছিল।

জাতীয় বাজেটের ২৫ ভাগ শিক্ষা খাতে বরাদ্দের দাবি

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট

হাম মহামারি মোকাবিলায়
‘জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা’
ঘোষণা করণ

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ১৯ মে ২০২৬, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে হাম মহামারিতে শিশু মৃত্যু, শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে অসম বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুক্তা বাউড়ি। উপস্থিত থেকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সহসভাপতি সুস্মিতা মরিয়ম, সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক সুহাইল আহমেদ শুভ, দপ্তর সম্পাদক অনিক কুমার দাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্যসচিব, অদিতি ইসলাম, ঢাকা নগর সাধারণ সম্পাদক ইনজামামুল হক প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়, আগামী ৭ জুন জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হবে এবং ১১ জুন ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা হবে। জনমনে প্রশ্ন উঠেছে এবারের বাজেটেও কি উপেক্ষিত হবে শিক্ষাখাত? সামরিক খাতের মতো অনুৎপাদনশীল খাতগুলিতে বরাদ্দের পরিমাণ যেমন ক্রমাগত বাড়ছে তার বিপরীত চিত্র শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে। যা বরাদ্দ হয় তার মধ্যে আবার রয়েছে শুভংকরের ফাঁকি। শিক্ষা খাতের সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাত যুক্ত করে দিয়ে শিক্ষাখাতের বরাদ্দের যে পরিমাণ দেখানো হয় প্রকৃতপক্ষে এককভাবে শিক্ষাখাতে তা আরও কম। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ৭৮৬ কোটি টাকার প্রথম বাজেটে



শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল ১৭৩ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ২২ শতাংশ। ৫৪ বছর পরে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটের আয়তন প্রায় ৭ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা হলেও শিক্ষা খাতে বরাদ্দ মোট বাজেটের মাত্র ১২.১১ ভাগ। বাজেটের আয়তন বাড়ছে প্রতিবছরই অথচ কমছে শিক্ষা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে শিক্ষা ও প্রযুক্তিখাত মিলিয়ে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল মোট বাজেটের ১৪.৭ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট বাজেটের ১৩.৭ শতাংশ ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট বাজেটের ১৩.৯ ভাগ। দীর্ঘ সময় ধরে ছাত্র সংগঠনগুলির শিক্ষাখাতে বাজেটের ২৫ ভাগ বা জিডিপি'র ৬ ভাগ বরাদ্দের দাবি উপেক্ষিত হয়ে আসছে। খোদ ইউনেস্কোর মতে শিক্ষা খাতে একটি দেশের জিডিপি'র ন্যূনতম ৬ ভাগ বরাদ্দ থাকা উচিত।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উল্লেখ করা হয়,

২০২৬ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি, নির্বাচনের মাত্র তিন দিন আগে; অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তৎকালীন নিরাপত্তা উপদেষ্টা—যিনি এখন বিএনপি সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে স্বাক্ষর করলেন ‘রেসিপ্রোকাল ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট’ বা আরটিএ। চুক্তিটির ৩২ পৃষ্ঠায় Bangladesh Shall শব্দটি আছে ১৫৮ বার। USA Shall আছে মাত্র ৯ বার। বাংলাদেশের জন্য May—অর্থাৎ এপ্রিল—শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ৫ বার, আমেরিকার জন্য ৮ বার। সংখ্যাগুলো নিজেই বলে দেয়, এটি পারস্পরিক সুবিধার চুক্তি নয়। এটি একটি অধীনতার দলিল। এই চুক্তির ফলে বাংলাদেশের জ্বালানি, কৃষি-শিল্প, অর্থনীতি সব কিছুই হুমকির মুখে পড়বে। সর্বোপরি বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে এবং ভূরাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশ চরম ঝুঁকিতে পড়বে। শুধু তাই নয়, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) ট্রিপস (TRIPS) এবং গ্যাটস (GATS)

কাঠামোর সুযোগ নিয়ে এই চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের শিক্ষা ও জ্ঞানতান্ত্রিক স্বকীয়তার ওপর চরম আঘাত হানা হয়েছে। এই চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশকে জোরপূর্বক ডব্লিউআইপিও (WIPO) কপিরাইট ট্রিটি, ইউপিওভি (UPOV) কনভেনশন, বুদাপেস্ট ট্রিটি এবং পেটেন্ট ল ট্রিটির মতো অন্তত ১২টি আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব চুক্তিতে আটপেঁতে বাঁধা হয়েছে। এর ফলে আমাদের দেশীয় কৃষি বীজের ওপর কৃষকের অধিকার লুপ্তিত হবে এবং বীজ সংরক্ষণের জন্য বহুজাতিক কোম্পানির লাইসেন্স নিতে হবে। বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পের বড় শক্তি হলো জেনেরিক ওষুধের সক্ষমতা। এই চুক্তির কঠোর মেধাস্বত্ব আইনের কারণে ‘পেটেন্ট ফি’ ও রয়্যালটি পরিশোধ করতে গিয়ে ইনসুলিন, ক্যানসার ও হৃদরোগের ওষুধের দাম ১০০০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে। এটি জনস্বাস্থ্যকে বৃহৎ বহুজাতিক ফার্মাসিউটিক্যালসের মুনাফার কাছে জিম্মি করে ফেলবে। বিদেশি কর্পোরেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অবাধে বাজার উন্মোক্ত করে দেওয়ার ফলে উচ্চশিক্ষা সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের সন্তানদের জন্য একটি বিলাসদ্রব্যে পরিণত হবে।

সংবাদ সম্মেলন থেকে নিম্নোক্ত তিন দফা দাবি উত্থাপন করা হয়।

১. হাম মহামারিকে জরুরি পরিস্থিতি ঘোষণা করে সকল সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে শিশুদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দাও, ফ্রি আইসিইউ সেবা নিশ্চিত কর। টিকা কার্যক্রমে অব্যবস্থাপনা ও অবহেলার জন্য দায়ীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাও।

২. জাতীয় বাজেটের ২৫ ভাগ বা জিডিপি'র ৬ ভাগ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ কর। স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ বাড়ান।

৩. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত জাতীয় স্বার্থবিরোধী বাণিজ্যচুক্তি অবিলম্বে বাতিল কর।

শিশু কিশোর মেলা আয়োজিত কুইজ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত



২০ মে ঐতিহাসিক মুন্স্ক চলো আন্দোলনের ১০৫তম বার্ষিকী। চা-শ্রমিক দিবস ও মহান মে দিবস স্মরণে শিশু কিশোর মেলা মৌলভীবাজার জেলা আয়োজিত কুইজের পুরস্কার বিতরণী জেলার রাজনগর চা বাগানে অবস্থিত রাজনগর পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং সদর উপজেলার মৌলভী চা বাগানে অবস্থিত মৌলভী টি এস্টেট আইডিয়াল স্কুলে দিবস দুটি স্মরণে আয়োজিত কুইজে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার ও সনদ শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত সভায় বক্তব্য দেন দুই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ, শিশু কিশোর মেলায় কেন্দ্রীয় সংগঠক বিশ্বজিৎ নন্দী, জেলা সংগঠক রাজিব সূত্রধর, শ্যামল সরকার, সুরাইয়া হক প্রমুখ।

আলোচকবৃন্দ বলেন, শিশু কিশোরদের বেড়ে ওঠতে হবে মুক্ত ও আনন্দদায়ক খোলামেলা পরিবেশে। নিয়মিত গল্প পড়া, ছবি আঁকা, গান শোনা ও গাওয়া, গল্প বলা বিতর্ক প্রতিযোগিতায় উৎসাহ দিতে হবে; অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। কল্পনাশক্তি ও ভাষা বিকাশে সহায়ক। তাদের দেশের প্রকৃত ইতিহাস, মানুষ, সংগ্রামের সাথে পরিচয় করাতে হবে, মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি সহমর্মিতা গড়ে তুলতে হবে। শিশুদের কুপমণ্ডকতা, মৌলবাদী ধ্যানধারণা বিরোধী বিজ্ঞানমনস্কতা, সৃজনশীলতা, সাম্যবোধ এবং শিশুদের মধ্যে মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা, দেশপ্রেম গড়ে তুলতে শিশু কিশোর মেলা শিশু কিশোরদের উপযোগী এমন কর্মসূচি আগামী দিনেও অব্যাহত রাখবে।

শাহ আলী মাজারে হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

মিরপুরে শাহ আলী মাজারে সংগঠিত মব হামলায় গণতান্ত্রিক যুক্ত ফ্রন্ট তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে ১৫ মে '২৬ মাজারের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ করে ঘটনার সাথে জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাসদের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রধান, বাসদ নেতা নাসির উদ্দীন প্রিন্স, বাসদ (মার্কসবাদী)র রাশেদ শাহরিয়ার প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, অবিলম্বে মিরপুরের শাহ আলী মাজারে হামলাকারীদের সিসিফুটেজ এবং ভিডিও দেখে চিহ্নিত করতে হবে। মব

সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, ইন্ধনদাতা এবং হামলাকারী সকল দায়ী ব্যক্তিকে আইনের আওতায় আনা এবং দ্রুত বিচারের দাবি জানান। এই গোষ্ঠীর বিচার না হলে ভবিষ্যতে এরা এই ধরনের কাজ করে যাবে। একইসঙ্গে সকল মাজার, দরবারসহ ঝুঁকিপূর্ণ বিভিন্ন ধর্মীয় কেন্দ্রসমূহের নিরাপত্তা জোরদার করার দাবি জানানো হয়।

নেতৃবৃন্দ বলেন, '২৪-এর গণ অভ্যুত্থানের পর স্বাধীনতার পরাজিত মৌলবাদী শক্তি চরমপন্থি গোষ্ঠীগুলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তারা জাতির ইতিহাস মুছে ফেলার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশবাসীকে এই শক্তিকে মোকাবিলা করতে হবে।



মন্দির ও মসজিদ : কাজী নজরুল ইসলাম

[২৫ মে ২০২৬ ছিল বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৭তম জন্মবার্ষিকী। আমরা কবির জন্মদিনে মন্দির ও মসজিদ প্রবন্ধটি প্রকাশ করছি শ্রদ্ধার্থ হিসাবে। এই প্রবন্ধটি ১৯২৬ সালের অক্টোবর মাসে রচিত এবং গণবাণী পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত। সম্পাদক]

‘মারো শালা যবনদের!’ ‘মারো শালা কাফেরদের!’—আবার হিন্দু মুসলমানি কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। প্রথমে কথা-কাটাকাটি, তারপর মাথা-ফাটাফাটি আরম্ভ হইয়া গেল। আল্লার এবং মা কালীর ‘প্রেস্টিজ’ রক্ষার জন্য যাহারা এতক্ষণ মাতাল হইয়া চিংকার করিতেছিল তাহারাই যখন মার খাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল, দেখিলাম—তখন আর তাহার আল্লা মিয়া বা কালী ঠাকুরানির নাম লইতেছে না। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি পড়িয়া থাকিয়া এক ভাষায় আত্নানাদ করিতেছে—‘বাবা গো, মা গো!’—মাতৃপরিত্যক্ত দুটি বিভিন্ন ধর্মের শিশু যেমন করিয়া এক স্বরে কাদিয়া তাহাদের মাকে ডাকে!

দেখিলাম, হত-আহতদের ক্রন্দনে মসজিদ টলিল না, মন্দিরের পাষাণ দেবতা সাড়া দিল না। শুধু নির্বোধ মানুষের রক্তে তাহাদের বেদি চিরকলঙ্কিত হইয়া রহিল।

মন্দির-মসজিদের ললাটে লেখা এই রক্তকলঙ্ক-রেখা কে মুছিয়া ফেলিবে, বীর?

ভবিষ্যৎ তাহার জন্য প্রস্তুত হইতেছে!

সেই রুদ্র আসিতেছেন, যিনি ধর্ম-মাতালদের আড্ডা ওই মন্দির-মসজিদ-গির্জা ভাঙিয়া সকল মানুষকে এক আকাশের গম্বুজ-তলে লইয়া আসিবেন।

জানি, শ্রুতার আপনি-মোড়ল ‘প্রাইডেট সেক্রেটারি’রা হ্যাট খুলিয়া, টুপি তুলিয়া, টিকি নাচাইয়া আমায় তাড়না করিবে, তবু ইহাদের পতন হইবে। ইহারা ধর্ম-মাতাল। ইহারা সত্যের আলো পান করে নাই, শাস্ত্রের অ্যালকোহল পান করিয়াছে।

পুসিফুট জনসন মাতালদের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া বহু মার খাইয়াছেন।

মুহম্মদকে যাহারা মারিয়াছিল, ইশা-মুসাকে যে-সব ধর্ম-মাতাল প্রহার করিয়াছিল, তাহাদেরই বংশধর আবার মারিতেছে মানুষকে—ইশা-মুসা মুহম্মদের মতো মানুষকে!

যেসব অবতার-পয়গম্বর মানুষের মার হইতে মানুষকে বাঁচাইতে আসিয়া মানুষের মার খাইয়া গেলেন, তাঁহারা আজ কোথায়? মানুষের কল্যাণের জন্য আসিয়াছিলেন যাঁহারা, তাঁহাদেরই মাতাল পশু শিষ্যেরা আজ মানুষের সর্ব অকল্যাণের হেতু হইয়া উঠিল।

যিনি সকল মানুষের দেবতা, তিনি আজ মন্দিরের কারাগারে, মসজিদের জিন্দানখানায় গির্জার gaol-এ বন্দি। মোল্লা-পুরুত, পাদরি-ভিক্ষু জেল-ওয়ার্ডের মতো তাহাকে পাহারা দিতেছে। আজ শয়তান বসিয়াছে শ্রুতার সিংহাসনে।

একস্থানে দেখিলাম, উপপঞ্চাশ জন ভদ্র-অভদ্র হিন্দু মিলিয়া একজন শীর্ণকায় মুসলমান মজুরকে নির্মমভাবে প্রহার করিতেছে, আর একস্থানে দেখিলাম, প্রায় ওই সংখ্যক মুসলমান মিলিয়া একজন দুর্বল হিন্দুকে পশুর মতো মারিতেছে। দুই পশুর হাতে মার খাইতেছে দুর্বল অসহায় মানুষ। ইহারা মানুষকে মারিতেছে যেমন করিয়া বুনা জংলি বর্বররা শূকরকে খোঁচাইয়া মারে। উহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, উহাদের প্রত্যেকের মুখ শয়তানের চেয়েও বীভৎস, শূকরের চেয়েও কুৎসিত! হিংসায়, কদর্যতায় উহাদের গাত্রে অনন্ত নরকের দুর্গন্ধ!

উহাদের দুই দলেরই নেতা একজন, তাহার আসল নাম শয়তান। সে নাম ভাঁড়াইয়া কখনও টুপি পরিয়া পর-দাড়ি লাগাইয়া মুসলমানদের খ্যাপাইয়া আসিতেছে, কখনও পর-টিকি বাঁধিয়া



বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৭তম জন্মবার্ষিকীতে বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের নেতৃত্বে ২৫ মে '২৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির সমাধিকে নেতৃত্বের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ও চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পক্ষ থেকেও পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়

হিন্দুদের লেলাইয়া দিতেছে, সে-ই আবার গোরা সিপাই গুর্খা সিপাই হইয়া হিন্দু-মুসলমানদের গুলি মারিতেছে! উহার ল্যাজ সমুদ্রপারে গিয়া ঠেকিয়াছে, উহার মুখ সমুদ্রপারের বুনা বাঁদরের মতো লাল!

দেখিলাম, আল্লার মসজিদ আল্লা আসিয়া রক্ষা করিলেন না, মা-কালীর মন্দির কালী আসিয়া আগলাইলেন না! মন্দিরের চূড়া ভাঙিল, মসজিদের গম্বুজ টুটিল!

আল্লার এবং কালীর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। আকাশ হইতে বজ্রাঘাত হইল না মুসলমানদের শিরে, ‘আবাবিলের’ প্রস্তর-বৃষ্টি হইল না হিন্দুদের মাথার উপর।

এই গোলমালের মধ্যে কতকগুলি হিন্দু ছেলে আসিয়া গৌফ-দাড়ি-কামানো দাঙ্গায় হত খায়র মিয়াঁকে হিন্দু মনে করিয়া ‘বলো হরি হরিবোল’ বলিয়া শাশানে পুড়াইতে লইয়া গেল, এবং কতকগুলি মুসলমান ছেলে গুলি খাইয়া হত দাড়িওয়ালা সদানন্দ বাবুকে মুসলমান ভাবিয়া ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পড়িতে পড়িতে কবর দিতে লইয়া গেল।

মন্দির এবং মসজিদ চিড় খাইয়া উঠিল, মনে হইল যেন উহারা পরস্পরের দিকে চাহিয়া হাসিতেছে!

মারামারি চলিতেছে। উহারই মধ্যে এক জীর্ণা-শীর্ণা ভিখারিনি তাহার সদ্যপ্রসূত শিশুটিকে বুকে চাপিয়া একটি পয়সা ভিক্ষা চাহিতেছে। শিশুটির তখনও নাড়ি কাটা হয় নাই। অসহায় ক্ষীণ কণ্ঠে সে যেন এই দুঃখের পৃথিবীতে আসার প্রতিবাদ করিতেছিল। ভিখারিনি বলিল, ‘বাছাকে আমার একটু দুধ দিতে পারছি না বাবু। এই মাত্র এসেছে বাছা আমার! আমার বুকে এক ফোঁটা দুধ নেই!’ তাহার কণ্ঠে যেন বিশ্ব-জননী কাদিয়া উঠিল। পাশের একটি বাবু বেশ একটু ইঙ্গিত করিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিয়া উঠিল, ‘বাবা! এই তো চেহারা, এক ফোঁটা রক্ত নেই শরীরে, তবু ছেলে হওয়া চাই!’

ভিখারিনি নিষ্পলক চোখে তাকাইয়া রহিল লোকটার দিকে। সে কী দৃষ্টি! চোখদুটো তার যেন তারার মতো জ্বলিতে লাগিল। ও যেন নিখিল হতভাগিনী নারীর জিজ্ঞাসা! এমনই করিয়া নির্বাক চোখে তাহারা তাকাইয়া থাকিয়াছে তাহারই দিকে—যে তাহার সর্বনাশ করিয়াছে। আমি যেন তার দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে পারিলাম। সে বলিতে চায়, ‘পেটের ক্ষুধা এত প্রচণ্ড বলিয়াই তো দেহ বিক্রয় করিয়াও সে ক্ষুধা মিটাইতে হয়!’

যে-লোকটি বিদ্রূপ করিল সে-ই হয়তো ওই শিশুর গোপন পিতা! সে না হয়, তারই একজন আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু অথবা তাহারই মতো মানুষ একজন ওই শিশুর জন্মদাতা!

ওই যে এক আকাশ তারা, উহারা ইহারই

মতো দুর্ভাগিনি ভুখারিনিদের চোখ, অনন্তকাল ধরিয়া ভোগ-ভৃগু বিশ্ববাসীকে কী যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে।

তিনদিন পরে আবার দেখিলাম, পথে দাঁড়াইয়া সেই ভিখারিনি। এবার তাহার বক্ষশূন্য। চক্ষুও তাহার শূন্য। যেদিন শিশু ছিল তার বুকে, সেদিন চক্ষে তার দেখিয়াছিলাম বিশ্বমাতার মমতা। অনন্ত নারীর করুণা সেদিন পূঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার চোখের তারায়, তাই সে সেদিন অমন সিক্ত কাতর কণ্ঠে ভিক্ষা চাহিতেছিল। আজ তাহার মনের মা বুঝি-বা মরিয়া গিয়াছে তাহার শিশুর সাথে। আজও সে ভিক্ষা চাহিতেছে, কিন্তু আর সে কাতরতা নাই তাহার কণ্ঠে, আজ যেন সে চাহিবার জন্যই চাহিতেছে! ...

আমায় সে চিনিল। আমি সেদিন তাহাকে আমার ট্রাম ভাড়ার পয়সা ছয়টি দিয়াছিলাম।—ভিখারিনির শুকচক্ষে হঠাৎ অশ্রুপুঞ্জ দুলিয়া উঠিল! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘তোমার ছেলে কোথায়?’ সে উর্ধ্বে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল। তাহার পর একটু থামিয়া আমায় বলিল, ‘বাবু, আমার সাথে একটু আসবেন?’ আমি সাথে সাথে চলিলাম।

পথের ধারে কৃষ্ণচূড়ার গাছ। তারই পাশে ডাস্টবিন। শহরের যত আবর্জনা জমা হয় ওই ডাস্টবিনে। আমি শিহরিয়া উঠিলাম। ভিখারিনি ডাস্টবিনের অনেকগুলো আবর্জনা তুলিয়া ময়লা ন্যাকড়া জড়ানো কী একটা যেন তুলিয়া লইয়া ‘জাদু আমার সোনা আমার’ বলিয়া উন্মাদিনীর মতো চুমা খাইতে লাগিল।

এই তাহার খোকন। এই তাহার জাদু, এই তাহার সোনা! ভিখারিনি ইহার পর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর শিশুটিকে আবার ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, ‘বাবু, ওই পয়সা কয়টি দিয়ে সেদিন একটা খারাব হয়ে-যাওয়া বার্লির টিন কিনেছিলুম। এ-কয়দিন ছেলেটাকে দিয়েছি ঠাণ্ডা জলে গুলে শুধু ওই পচা বার্লি আমিও খেয়েছি একটু করে—যদি আমার বুকে দুধ আসে! দুধ এল না এই হাড়-চামড়ার শরীরে! এক ফোঁটা দুধ পেলে না বাছা আমার, এই তিন দিনের মধ্যে! শেষে আর বার্লিও দিতে পারলুম না, আজ সে চলে গেল! ভালোই হয়েছে, বাছা আমার এবার খুব বড়ো লোকের ঘরে জন্মায় যেন। একটু পেটে দুধ খেয়ে বাঁচবে!’

চলে গেল ভিখারিনি আবার ভিক্ষা মাগতে! ডাস্টবিন হইতে ভিখারিনির পুত্রকে বুকে তুলিয়া লইয়া আমি চলিলাম গোরস্থানের দিকে।...

কাল এমনি করিয়া প্রতি বৎসর বাংলার দশ লক্ষ সন্তানের মরা লাশ বুকে ধরিয়া চলিতেছে শ্মশানের পানে, গোরস্থানের পথে।

যাইতে যাইতে দেখিলাম, সেদিনও মন্দির আর মসজিদের ইট-পাথরের স্তূপ লইয়া হিন্দু-মুসলমান সমানে কাটাকাটি করিতেছে।

শিশুর লাশ-কোলে আমি বহুক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। শিশুর লাশ যেন একটা প্রতিকার প্রার্থনা, একটা কৈফিয়ত তলবের মতো দেখাইতে লাগিল। ধর্ম-মদান্দের তখন শিশুর লাশের দিকে তাকাইয়া দেখিবার অবসর ছিল না। তাহারা তখন ইট-পাথর লইয়া বীভৎস মাতলামি শুরু করিয়া দিয়াছে!

এমনি করিয়া যুগে যুগে ইহারা মানুষকে অবহেলা করিয়া ইট-পাথর লইয়া মাতামাতি করিয়াছে। মানুষ মারিয়া ইট-পাথর বাঁচাইয়াছে। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বঙ্গ-জননী তাহার দশ লক্ষ অনাহার-জীর্ণ রোগশীর্ণ অকালমৃত সন্তানের লাশ লইয়া ইহাদের পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, ইহাদের ক্রক্ষেপ নাই। ইহারা মানুষের চেয়ে ইট-পাথরকে বেশি পবিত্র মনে করে! ইহারা ইট-পূজা করে! ইহারা পাথর-পূজারি!

ভূত-পাওয়ার মতো ইহাদেরে মন্দিরে পাইয়াছে, ইহাদেরে মসজিদে পাইয়াছে। ইহাদের বহু দুঃখ ভোগ করিতে হইবে!

যে দশ লক্ষ মানুষ প্রতি বৎসর মরিতেছে শুধু বাংলায়,—তাহারা শুধু হিন্দু নয়, তাহারা শুধু মুসলমান নয়, তাহারা মানুষ—শ্রুতার প্রিয় সৃষ্টি!

মানুষের কল্যাণের জন্য ওই-সব ভজনালায়ের সৃষ্টি, ভজনালায়ের মঙ্গলের জন্য মানুষ সৃষ্ট হয় নাই। আজ যদি আমাদের মাতলামির দরুন ওই ভজনালায়ই মানুষের অকল্যাণের হেতু হইয়া উঠে—যাহার হওয়া উচিত ছিল স্বর্গ-মর্ত্যের সেতু—তবে ভাঙিয়া ফেলো ওই মন্দির-মসজিদ! সকল মানুষ আসিয়া দাঁড়াইয়া বাঁচুক এক আকাশের ছত্রতলে, এক চন্দ্র-সূর্য, তারা-জ্বালা মহামন্দিরের আড়িনা তলে!

মানুষ তাহার পবিত্র পায়ে-দলা মাটি দিয়া তৈরি করিল ইট, রচনা করিল মন্দির-মসজিদ। সেই মন্দির-মসজিদের দুটো ইট খসিয়া পড়িল বলিয়া তাহার জন্য দুই শত মানুষের মাথা খসিয়া পড়িবে? যে এ কথা বলে, আগে তাহারই বিচার হউক।

দুইটা ইটের ঋণ যদি দুই শত মানুষের মাথা দিয়া পরিশোধ করিতে হয়, তবে বাঙালি জাতির যে এই বিপুল দেহ-মন্দির হইতে দশ লক্ষ করিয়া মানুষ খসিয়া পড়িতেছে প্রতি বৎসরে শোষণ-দৈত্যের পেষণে, এই মহা-ঋণের পরিশোধ হইবে কত লক্ষ মানুষের মাথা দিয়া?

মন্দির-মসজিদের চূড়া আবার গড়িয়া উঠিবে এই মানুষেরই পায়ে-দলা মাটি দিয়া, পবিত্র হইয়া উঠিবে এই মানুষেরই শ্রমের পবিত্রতা দিয়া; শুধু তাহারাই আর ফিরিয়া আসিবে না, যাহারা পাইল না একটু আলো, একটু বাতাস, এক ফোঁটা ওষুধ, দু চামচ জল-বার্লি! যাহারা তিলে তিলে মরিয়া জাতির হৃদয়হীনতার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে! যাহাদের মৃত্যুর মধ্য দিয়া সমগ্র জাতি মরিতেছে তিলে তিলে!

আমি ভাবি, যখন রোগ-শীর্ণ জরা-জীর্ণ অনাহার-ক্লিষ্ট বিবস্ত্র রুতুক্ষু সর্বহারা ভুখারিদের দশ লক্ষ করিয়া লাশ দিনের পর দিন ধরিয়া ওই মন্দির-মসজিদের পাশ দিয়া চলিয়া যায়, তখন ধসিয়া পড়ে না কেন মানুষের ওই নিরর্থক ভজনালায়গুলো? কেন সে ভূমিকম্প আসে না পৃথিবীতে? কেন আসে না সেই রুদ্র—যিনি মানুষ-সমাজের শিয়াল-কুকুরের আড্ডা ওই ভজনালায়গুলো ফেলবেন গুঁড়িয়ে—দেবেন মানুষের ট্রেডমার্কের চিহ্ন ওই টিকি-টুপিগুলো উড়িয়ে?

মন্দির-মসজিদের সামনে বাজনা বাজাইলে হয় তার প্রতিকার, আসে তার জন্যে মুদ্রা হাজার এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৪

গৃহস্থালী কাজের আর্থিক মূল্য নির্ধারণ ও স্বীকৃতি প্রদান

নারীর নিরাপত্তায় বাজেট বরাদ্দের দাবি

সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম

ডে-কেয়ার সেন্টার, কর্মজীবী নারী হোস্টেল, নিরাপদ গণপরিবহন ও স্বাস্থ্য-শিক্ষা, কর্মসংস্থানে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দের আহ্বান

নারীর গৃহস্থালী কাজের আর্থিক মূল্য রাষ্ট্রীয়ভাবে নিরূপণ ও স্বীকৃতি, সরকারিভাবে ডে-কেয়ার সেন্টার, কর্মজীবী নারী হোস্টেল নির্মাণ, নিরাপদ গণপরিবহন নিশ্চিত, মা ও শিশু হাসপাতাল, স্বাস্থ্যসম্মত পাবলিক টয়লেট এবং নারীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা-কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাজেট বরাদ্দের দাবিতে ৮ মে '২৬ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি প্রকৌশলী শম্পা বসু। বক্তব্য রাখেন সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. মনীষা চক্রবর্তী, ঢাকা নগর শাখার দপ্তর সম্পাদক লাবনী আক্তার, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুক্তা বাউড়ী। সমাবেশ পরিচালনা করেন মহিলা ফোরাম ঢাকা নগর শাখার সাধারণ সম্পাদক রুখশানা আফরোজ আশা।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, পরিবার পরিচালনায় গৃহস্থালী কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই কাজের ৮৫ ভাগ করেন নারীরা। সিপিডির গবেষণা অনুযায়ী গৃহে একজন নারী দিনে প্রায় ৪৫ ধরনের কাজ করেন, কিন্তু এই কাজের কোন স্বীকৃতি এবং মর্যাদা পরিবার এবং রাষ্ট্রে নেই।



সে কারণেই পরিবারে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে গৃহিণী নারীদের অংশগ্রহণ তার স্বামী বা পরিবারের অন্য সদস্যরা খুব একটা গ্রহণ করেন না। অর্থাৎ সংসারে নারীদের দায়িত্ব যত আছে অধিকার সে পরিমানে নেই। বিশ্বের অনেক দেশেই বিবাহ বিচ্ছেদের পর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সমান সম্পত্তি ভাগ করার আইন আছে। অর্থাৎ যদি ২০ বছর সংসার করার পর কোন স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ হয় তাহলে এই ২০ বছরে সৃষ্ট মোট সম্পত্তি সমান সমান ভাগ হবে। কিন্তু আমাদের দেশের বাস্তবতা হলো সংসার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নারীর শারীরিক-মানসিক শ্রম থাকা সত্ত্বেও নারীরা স্বামীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদের পর সম্পত্তির প্রায় কোন অংশই পান না। ফলে গৃহিণীরা অসহায় হয়ে পড়েন। অথচ বিয়ের পর

এ সংসারের যা কিছু সম্পদ-সম্পত্তি অর্জিত হয়েছে গৃহিণী নারীরও সেখানে সমান ভূমিকা আছে। গৃহস্থালী কাজের আর্থিক মূল্য নিরূপণ ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি থাকলে পরিবারের ও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তন হতো। পারিবারিক নির্যাতনও কমতো।

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, বাজেট শুধু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নয়, বাজেটের মাধ্যমে সরকারের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও প্রতিফলিত হয়। দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীর অগ্রযাত্রার সাথে দেশের এগিয়ে যাওয়াও যুক্ত। যেসব কারণে নারীরা কর্মক্ষেত্রে আসতে পারেন না বা কর্মক্ষেত্রে থেকে ঝড়ে পড়েন ওইসব বাধাগুলো দূর করার কার্যকর উদ্যোগ নেয়ার জন্য বাজেটে বরাদ্দ প্রয়োজন। পড়াশোনা নারীদের রেজাল্ট ভালো হয় কিন্তু

চাকরি ক্ষেত্রে সেই অনুপাতে পিছিয়ে পড়ে। কারণ পরিবারের দায়িত্ব তাকে পালন করতে হয়, সন্তানের দেখভালের দায়িত্ব তার ওপর থাকে। ফলে সুযোগ থাকলেও রাষ্ট্রের পরিপূরক আয়োজন যেমন ডে-কেয়ার সেন্টার, নিরাপদ গণপরিবহন ইত্যাদি না থাকায় তাকে পিছিয়ে যেতে হয়। ট্রান্সফারের চাকরি নারীদের জন্য চিন্তা করাও কঠিন কারণ তার থাকার জায়গার নিরাপত্তা নেই। সরকারি উদ্যোগে উপজেলায় উপজেলায় ডে কেয়ার সেন্টার ও কর্মজীবী নারী হোস্টেল নির্মাণের জন্য বাজেট বরাদ্দ করলে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান হতে পারে এবং অনেক নারী কর্মক্ষেত্রে যুক্ত হতে পারে। কিন্তু সে বিষয়ে বাজেটে বরাদ্দ থাকে না। স্বাস্থ্যসম্মত পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, হাসপাতালে মাতৃ সদন নির্মাণে খুব বেশি বাজেট বরাদ্দ লাগে না। এবার হামের টিকার অভাবে ৩০০ এর বেশি শিশু ইতিমধ্যেই মারা গিয়েছে। টিকার সংকটের সাথে সাথে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছে আমাদের শিশুদের চিকিৎসার চিত্র। মা ও শিশু হাসপাতালগুলো কার্যকর থাকলে ভয়াবহতা অনেকটাই কমে আসত। এ বিষয়ে কোন আলোচনা বা উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় নাই।

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম মনে করে নারীর সম অধিকার নিশ্চিত করা এবং পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে সমাজে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে যেসকল প্রতিবন্ধকতা তা দূর করার কার্যকর উদ্যোগ নেয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের এবং সেসকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখতে হবে। পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর শ্রমের অবদানের স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে হবে।

অধ্যাপক মাহবুবা ইয়াসমিন রীতার শোক সভা অনুষ্ঠিত

চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বগুড়া জেলার উপদেষ্টা, বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ এর সাবেক সহযোগী অধ্যাপক, সাবেক ছাত্রনেতা, রাকসুর সাবেক সহ মহিলা সম্পাদিকা মাহবুবা ইয়াসমিন রীতার মৃত্যুতে শোকসভা চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বগুড়া জেলার উদ্যোগে ২৩ মে '২৬ ম্যারামোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বগুড়ার সভাপতি রাধা রানী বর্মণ। প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক, গণতান্ত্রিক যুক্ত ফ্রন্টের অন্যতম শীর্ষ নেতা কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, বক্তব্য রাখেন সাবেক অধ্যক্ষ, বীর মুক্তিযোদ্ধা শোয়েব শাহরিয়ার, বাসদ জেলা আহ্বায়ক অ্যাড. সাইফুল ইসলাম পল্টু, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি বগুড়া জেলা সভাপতি কমরেড আমিনুল ফরিদ, ক্যান্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের সাবেক ভাইস প্রিন্সিপাল নার্গিস ফজিলা বানু, বগুড়া নাট্যদলের সভাপতি মির্জা আহসান দুলাল, সাবেক কাউন্সিলর আবু হাসান, শিক্ষক ফিরোজ আহমেদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রনেতা আব্দুল মান্নান, পরিবারের সদস্য আবু জাকারিয়া, সঙ্গীত শিল্পী তাপসী দে, সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রে মজুর ও কৃষক ফ্রন্টের জেলা সভাপতি মাসুদ পারভেজ, বাংলাদেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের জেলা সমন্বয়ক আমিনুল ইসলাম, বাংলাদেশ জাসদ বগুড়া জেলার সাংগঠনিক সম্পাদক ইসমাঈল হোসেন দুখু, শিক্ষার্থী নাবিদ আহমেদ প্রমুখ।

শোকসভার শুরুতে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র



বগুড়া জেলা শাখা সঙ্গীত পরিবেশন করে।

কমরেড ফিরোজ বলেন, আজকের এই শোকসভায় আমি গভীর শ্রদ্ধা ও বেদনার সাথে স্মরণ করছি মাহবুবা ইয়াসমিন রীতাকে। বর্তমান সমাজে, বিশেষ করে শিক্ষক মহলে যখন সামাজিক দায়বদ্ধতাসম্পন্ন মানুষের অভাব প্রকট, ঠিক সেই সময়ে মাহবুবা ইয়াসমিন নীরবে, নিষ্ঠায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে। তিনি ছিলেন একাধিক গুণে গুণাবিত—যেমন দক্ষ শিক্ষিকা, সংস্কৃতিমনা শিল্পী, তেমনি একজন সাহসী রাজনৈতিক সচেতন নারী।

সঙ্গীত চর্চার পাশাপাশি তিনি তার স্বামীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন। শুধু সংসারের সঙ্গিনী নন, বরং আদর্শের সহযাত্রী হিসেবে তিনি প্রতিটি রাজনৈতিক পদক্ষেপে পাশে থেকেছেন, প্রেরণা

দিয়েছেন। এ কারণেই তাঁকে আমরা বলতে পারি—তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থে একজন কমরেড, একজন সহযোদ্ধা।

আজ সমাজ যখন নানাভাবে অবক্ষয়ের মুখে, মেহনতি মানুষের পাশে প্রকৃত বন্ধু হিসেবে প্রেরণায় দাঁড়ানোর মানুষের সংখ্যা যখন কম, সেই প্রেক্ষাপটে মাহবুবা ইয়াসমিন রীতার মতো একজন নিবেদিতপ্রাণ মানুষের কথা স্মরণ করা শুধু শ্রদ্ধার বিষয় নয়, এটি এক ধরনের অনুপ্রেরণাও বটে। তিনি যেভাবে সারা জীবন সামাজিক দায়বোধ ও দেশপ্রেমের চর্চা করেছেন, প্রগতির পক্ষে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে ছিলেন, আজকের এই সংকটময় সময়ে সেই আদর্শকে ধারণ করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। তাঁকে স্মরণ করার মানে হলো—সমাজের অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, দেশপ্রেমের পথে উদ্বুদ্ধ হওয়া এবং সামনের দিনগুলোতে

নৈতিকতা ও দায়বদ্ধতার পথচলাকে অব্যাহত রাখা। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শোয়েব শাহরিয়ার বলেন, রীতাকে যে ব্যক্তি যে কোন থেকে দেখেছেন তিনি সেখানেই ছিলেন অনন্য, মহীয়সী। একদিকে কঠোর শিক্ষক, অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের জন্য মমতাময়ী অভিভাবক। একজন মানবিক মানুষ, একজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, একজন রাজনৈতিক সহযোদ্ধা। আজকের এই শোকসভায় না এলে তাকে এতো দিক থেকে আলো ফেলে দেখার সুযোগ হতো না। অবশ্য যিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করেন তার এমন মানবিক শিক্ষকই হওয়ার কথা।

কমরেড সাইফুল ইসলাম পল্টু বলেন, রীতা একজন সচেতন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ। আমাদের দাম্পত্যজীবন শুধুমাত্র সংসারের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। আমরা শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির সংগ্রাম এগিয়ে নেওয়ার জন্য পরস্পরকে সহযোগিতা করতাম। রীতা পাশে ছিল রাজনৈতিক সহযোদ্ধা হয়ে।

অন্যান্য আলোচকবৃন্দ বলেন, মাহবুবা কেবল একজন ব্যক্তি ছিলেন না, ছিলেন আশ্রয়ের জায়গা। তিনি গরিব শিক্ষার্থীদের নিভৃতের আশ্রয় ছিলেন, তাদের দেখাতেন স্বপ্ন। অন্যদিকে সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক কর্মীদেরও ছিলেন আশ্রয়স্থল। ছিলেন আত্মীয়স্বজনেরও প্রিয়মুখ। যিনি মানুষের জন্য নিবেদিত ও উদার মনের ছিলেন। দেহে তার মৃত্যু হলেও চেতনায় তিনি বেঁচে থাকবেন। তাঁর মৃত্যুতে তার পরিবার ও আমাদের সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে। তবে তার বিশাল কর্মকাণ্ড তাকে বাঁচিয়ে রাখবে মানুষের মধ্যে।

মজুরি-ভূমির অধিকার, মানবিক জীবনের দাবি : ১০৫তম চা-শ্রমিক দিবস পালিত

বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ফেডারেশন

১০৫তম চা-শ্রমিক দিবস স্মরণে বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ফেডারেশন ২৪ মে মৌলভীবাজার পৌরসভা মিলনায়তনে আলোচনাসভার আয়োজন করে। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি বিপ্লব মাদ্রাজি পাশী'র সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক দীপংকর ঘোষ-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় আলোচনা করেন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবীব বুলবুল, বাসদ মৌলভীবাজার জেলা সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট মঈনুর রহমান মগনু, শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আবু জাফর, চা-শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা উজ্জল রায় ও অ্যাড. আবুল হাসান, কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি কাজল রায়, সাংগঠনিক সম্পাদক কিরণ গুরু বৈদ্য, নির্বাহী সদস্য ময়না রাজভর, হামিদিয়া চা বাগান পঞ্চায়েত কমিটির সাধারণ সম্পাদক বুলু উড়াং, করিমপুর বাগানের বিমল বাগতী, শ্রীমতি কায়স্ত, মায়া কর-সহ বিভিন্ন চা বাগানের শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, ১৮৫৪ সালে সিলেটের মালনীছড়ায় প্রথম চা বাগান প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু এই চা বাগান প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় আরও দুই দশক আগে থেকেই ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের দরিদ্র ১১৬টি জনগোষ্ঠীর মানুষকে উন্নত জীবনের প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে আসা হয়। ‘গাছ হেলালেই পয়সা মিলবে’—এ ধরনের লোভনীয় কথায় প্রলুব্ধ করে তাদের বন্যপ্রাণীর সঙ্গে লড়াই করতে, বনজঙ্গল পরিষ্কার করতে ও জমি তৈরির কাজে লাগানো হয়।

চা বাগানের ব্রিটিশ মালিকরা তাদের প্রলুব্ধ



করতে তাদেরই গোত্রের মানুষদের মধ্য থেকে ‘আড়কাঠি’ বা দালাল নিয়োগ করেছিল। অর্থাৎ চা-শ্রমিকদের জনগোষ্ঠীর ভেতর থেকেই কিছু লোক কমিশনের লোভে নিজেদের গোত্রের মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের ব্রিটিশদের কাছে দাসত্বের চুক্তিতে বিক্রি করে দেয়।

নেতৃবৃন্দ বলেন, গহীন জঙ্গল পরিষ্কার করে বাগান বানাতে গিয়ে বন্য প্রাণীর আক্রমণ, অনাহার ও বিভিন্ন রোগবাহাইয়ে বিনা চিকিৎসায় হাজার হাজার চা-শ্রমিকের মৃত্যু হয়। অথচ চা গাছের পাতা টাকা হয়ে জমা হচ্ছিল চা বাগান মালিকের পকেটে। অমানবিক পরিশ্রম করেও অনাহার, অবহেলা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে চা-শ্রমিকদের মধ্যে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ তৈরি করেছিল যারা, তারা ছিল চা-জনগোষ্ঠী বা গোত্রের বাইরের মানুষ।

শ্রমশোষণ ও নির্যাতনের প্রতিবাদে ১৯২১ সালের ২০ মে হাজার হাজার চা-শ্রমিক নিজেদের

মূলভূমিতে ফিরতে রেললাইন ধরে চাঁদপুর জাহাজঘাটে পৌঁছে। সেখানে ব্রিটিশ মালিকদের নির্দেশে গোঁরাবাহিনী গুলি চালিয়ে কয়েক হাজার শ্রমিককে হত্যা করে। জীবিত শ্রমিকদের বাধ্য করা হয় চা বাগানে ফিরে আসতে। তখনও চা শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে ধর্মঘট পালন করেছিল জাহাজ শ্রমিক ও রেল শ্রমিকরা।

শোষণের বিরুদ্ধে চা-শ্রমিকদের এই বিদ্রোহের সাহসিকতা ও শ্রমিক আন্দোলনের এই সংহতি থেকে শিক্ষা নিয়েই বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন ২০০৮ সাল থেকে এই দিবসটি পালনের মাধ্যমে আলোচনায় আনে এবং দিনটিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ‘চা শ্রমিক দিবস’ হিসেবে স্বীকৃতির দাবি তোলে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, উৎপাদন বেড়েছে, জীবনমান বদলায়নি। বর্তমানে দেশে চায়ের উৎপাদন ও ব্যবহার বেড়েছে, কিন্তু চা-শ্রমিকদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটেনি। একদিকে নিলাম কৌশলে চায়ের প্রকৃত বাজারমূল্য আড়াল

করার মাধ্যমে বাগান মালিক ও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তারা চা উৎপাদনকে অলাভজনক দেখানোর কৌশল করেন। অপরদিকে চা-শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী নেতৃত্ব বাগান মালিকদের কাছ থেকে শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি, ভূমির অধিকার, স্বাস্থ্যকর আবাসন, চিকিৎসা ও শিক্ষার অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার পরিবর্তে—শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতা ও দক্ষতার বিকাশে বাধা দিচ্ছেন। তারা শ্রেণি সচেতনতা তৈরি বা নেতৃত্ব বিকাশে বাধা সৃষ্টি করছেন এবং দ্বিপাক্ষিক চুক্তির নামে বছরের পর বছর ধরে মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির কৌশলের ফাঁদে আটকে রেখেছেন চা শ্রমিকদের।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আজ শ্রমিকদের চিনতে হবে প্রকৃত বন্ধু ও কায়মি স্বার্থবাদীর সাথে যুক্ত দালাল নেতাদের। বৈষম্য ও শোষণের এই ফাঁদ থেকে মুক্ত হতে বাংলাদেশের চা শ্রমিকদের তাদের ‘বন্ধু’ ও ‘আড়কাঠিদের’ চিনতে হবে। বৈষম্য বিলোপের প্রতিশ্রুতিতে দেশে অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়েছে, কিন্তু শ্রমিকদের পক্ষে শ্রেণি সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদী কণ্ঠ শক্তিশালী করা ছাড়া মজুরি বৈষম্য ও মজুরি চুরি বন্ধ হবে না।

চা-শ্রমিকদের দৈনিক নগদ মজুরি ৬০০ টাকা নির্ধারণ, ভূমি মালিকানার অধিকার, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত করতে হলে আপসকামী ধারার ইউনিয়নের বিপরীতে আদর্শবাদী শ্রমিক আন্দোলনের ধারা এবং চা শ্রমিক ফেডারেশনকে শক্তিশালী করতে হবে। সারা দেশের চা বাগানের একক শ্রমিক ইউনিয়নের সিডিকেট ব্যবস্থার বিপরীতে বাগানভিত্তিক স্বাধীন দরকষাকষির হাতিয়ার তৈরি করার দাবিকেও শক্তিশালী করতে হবে।

শিক্ষা-স্বাস্থ্য, কৃষিতে বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ জনকল্যাণমুখী বাজেট প্রণয়ন কর

ধনী তোষণের বাজেট নয়—জনকল্যাণমুখী বাজেট—শিক্ষা-স্বাস্থ্য, কৃষি-শিল্পসহ সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে অসম বাণিজ্য চুক্তি বাতিল, এনসিটি টার্মিনাল ডিপি ওয়াশল্কে ইজারা দেয়ার পঁয়তারা বন্ধ, জ্বালানি তেল-গ্যাস, বিদ্যুতের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহার এবং রামিসাসহ সকল শিশু ধর্ষণের বিচার, ‘হামকে জরুরি স্বাস্থ্য পরিস্থিতি’ বা মহামারি হিসেবে ঘোষণার দাবিতে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ ঢাকা নগর শাখার উদ্যোগে ১২ জুন ‘২৬ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বাসদ ঢাকা মহানগর শাখার ইনচার্জ নিখিল দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জুলফিকার আলী, নগর নেতা আহসাম হাবিব বুলবুল, জাকির হোসেন, রুখসানা আফরোজ আশা। সমাবেশ পরিচালনা করেন নগর নেতা খালেদুজ্জামান লিপন।

সমাবেশে কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, সরকার ১১ জুন ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করেন। যা স্বাধীনতার পর এ যাবতকালের সবচেয়ে বড় বাজেট ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকার। এর মধ্যে ২ লাখ ৪৩ হাজার কোটি টাকা এটাও সবথেকে বড় ঘাটতি বাজেট। ঘাটতি পূরণে দেশি বিদেশী ঋণের কথা বলা হয়েছে।

এবছর ঋণের সুদ বাবদ পরিশোধ করতে হবে ১ লাখ ২৭ হাজার কোটি টাকা, যা ব্যয়ের অন্যতম বড় খাত। ঋণনির্ভর বড় বাজেট ও



সুদ পরিশোধের ব্যয়ের অন্যতম বড় খাত, এটা সরকারের বড় দুর্বলতারই প্রকাশ। চলতি অর্থবছরের রাজস্ব আদায়ের যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল তা অর্জন করা যায়নি। কেন করা যায়নি তার ব্যাখ্যা ছাড়াই উচ্চাভিলাষী রাজস্ব আয়ের টার্গেট নেয়া হয়েছে, যা আদায় প্রায় অসম্ভব। আইএমএফের পরামর্শে জনগণের উপর পরোক্ষ করের বোঝা বাড়ানো হয়েছে, ধনীর স্বার্থে উৎস কর কমানো হয়েছে।

কমরেড ফিরোজ বলেন, এই বাজেটে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের সুনির্দিষ্ট ও বাস্তবসম্মত কোনো দিকনির্দেশনা নেই। বেকারত্ব ও মূল্যস্ফীতির গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা মোকাবিলায় নিছক ঘোষণায় কাজ হবে না, প্রয়োজন সুস্পষ্ট কর্মপরিকল্পনা, যা এই বাজেটে অনুপস্থিত।

তিনি বলেন, সামরিক খাতসহ অনুৎপাদনশীল খাতগুলো বরাবরের মতো গুরুত্ব পেয়েছে, অন্য দিকে শিক্ষা-স্বাস্থ্য, কৃষি-শ্রমসহ জনকল্যাণমুখী গুরুত্বপূর্ণ খাত অবহেলিতই রয়ে গেছে। বাজেটে কালোটাকা সাদা করার প্রস্তাব সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক ও দুর্নীতিকে উৎসাহিত করবে।

তিনি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, এই বাজেট সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নের কোনো ভূমিকা তো রাখবেই না উপরন্তু ব্যয় বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে এটি ধনীদের পক্ষে সুযোগ বৃদ্ধি করবে। সরকার যদি সত্যিই জনকল্যাণে বিশ্বাস করে, তবে তাকে বাজেটের এই ভারসাম্যহীনতা, ঋণনির্ভরতা ও অসাম্য নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। অন্যথায় এই বাজেট অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার পরিবর্তে ভবিষ্যতে আরও গভীর সংকট ডেকে আনবে বলেও তিনি সতর্ক করেন।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, জ্বালানি তেল, গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির ফলে জনগণের ভোগান্তি বাড়েছে। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির ফলে উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে এবং প্রতিটি খাতে ব্যয় বাড়বে আর ব্যয় বৃদ্ধির বোঝা জনগণের কাধে এসে পড়বে। শ্রমিক-কৃষক মেহনতি-গরিব, মধ্যবিত্ত মানুষের আয় বাড়েনি, বাধ্য হয়ে মানুষ খাবারের মান কমিয়ে দিচ্ছে, পুষ্টিহীনতার শিকার হচ্ছে। যার ফলে শিশুদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমছে বয়স্কদের উৎপাদন শীলতায় প্রভাব পড়ছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, হামে আক্রান্ত শিশু মৃত্যু খামছে না। বিচারহীনতার সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ে নারী-শিশুর প্রতি সহিংসতা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। চট্টগ্রাম বন্দরের লাভজনক নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল বিদেশি কোম্পানি ডিপি ওয়াশল্কে ইজারা দেওয়ার পঁয়তারা বিগত স্বেচ্ছাচারী হাসিনা সরকার ও ডা. ইউনুস সরকার করেছিল, বর্তমান সরকারও ওই প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত এই বাণিজ্য চুক্তি আমাদের কৃষি-ঔষুধশিল্পসহ বিভিন্ন শিল্প, আর্থিক ও বাণিজ্যিক খাত ধ্বংস করবে এবং সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি। বর্তমান সরকার এই দাসত্বের চুক্তি বাতিল না করে জনমতের ইচ্ছাকে তোয়াক্কা না করে বাস্তবায়ন শুরু করে দিয়েছে, যা জাতির জন্য অশনিসংকেত।

নেতৃবৃন্দ মার্কিনের সাথে করা গোলামি চুক্তি বাতিল এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও দেশি-বিদেশি লুটপাটকারীদের বিরুদ্ধে রাজপথের আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার এবং লড়াইকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সকল দেশপ্রেমিক জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

জনমনে প্রশ্ন, কী হচ্ছে দেশে?

কী হচ্ছে দেশে? মানুষের জীবনে স্বস্তি আসবে না? এই প্রশ্ন এখন মানুষের মুখে। গত চার মাসে ১১৮ কন্যাশিশু ধর্ষণের শিকার, খুন হয়েছে ১৭ জন। শিশুদের ওপর এই জঘন্য নিপীড়নের ঘটনা দেখতে দেখতে, মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষের জন্য এক যন্ত্রণাময় পরিবেশ তৈরি হয়েছে দেশে। পত্রিকার পাতা খুললে নারী ও শিশুনির্যাতন, হত্যার যে সমস্ত খবর চোখে পড়ে তাতে কি মানসিক সুস্থতা বজায় রাখা যায়? কতটা কষ্ট দিয়ে হত্যা করা হয় তাদের! যে সময় তাদের সবার স্নেহ-ভালোবাসা নিয়ে বেড়ে ওঠার বয়স, সেই বয়সে ধর্ষণের শিকার হতে হয়েছে তাদের। অত্যাচারীর প্রতি ঘণার পাশাপাশি মানুষের ভেতর থেকে এই প্রশ্ন ক্ষোভের আকারে বেরিয়ে আসে, দেশে কি কোনো বিচার নেই? মৃত শিশুর খোলা চোখ যেন অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তারা বিশ্বাস করতে পারছে না, কেউ তাদের সঙ্গে এ-রকম আচরণ করতে পারে! তারা যেন বলছে, আমাদের বাঁচার অধিকার তোমরা দিলে না?

একের পর এক ঘটনা ঘটছে আর আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে শিশুদের অভিভাবকরা। ঘরে-বাইরে, স্কুল-মাদ্রাসা, অফিস এমনকি উপাসনালয়েও যেন নারী ও শিশুরা নিরাপদ নয়। ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে তাদের পৃথিবী। ছোটদের জীবনকে আশঙ্কা আর আতঙ্কে ভরিয়ে তুলল যারা, তারা তো বড়। বয়সে কিংবা ক্ষমতায় বড়। এমনকি শিক্ষায়ও বড়। কিন্তু শিক্ষায় বড় হলেই কেউ মানুষ হয় না। কোন দীক্ষায় তারা দীক্ষিত, সেটা গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণেই আমাদের বাংলাভাষায় শব্দ আছে, শিক্ষা-দীক্ষা। অর্থাৎ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বা দীক্ষাটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটা অর্জিত না হলে শিক্ষিত হলেও একজন ভালোমানুষ হবে না, ডাক্তার মানবিক হয়ে ওঠবে না। প্রকৌশলী অঙ্কের হিসাব বুঝবে, সমাজের দায় বুঝবে না। আইনজীবী আইন চর্চা করবে কিন্তু নিজে আইনের শাসন মানবে না। বিচারালয়ে বিচার হবে, কিন্তু গায়ের জোর বা ক্ষমতার জোরের কাছে যুক্তি পরাস্ত হবে। গণতন্ত্রের কথা বলে নির্বাচন হবে কিন্তু গণতন্ত্র চর্চা হবে না। যার তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে এবং এখনো আশঙ্কা রয়েছে।

শুধু আমাদের দেশে নয়, বিশ্বের সর্বত্র গণতন্ত্র কথাটা যত বহুলভাবে উচ্চারিত হয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা যেন ততটাই কম করা হয়। কিন্তু গণতন্ত্র একটা অকার্যকর আগুবাফ্য হয়ে পড়ে, যদি ব্যবস্থাটা গণতান্ত্রিক না হয়। স্বেচ্ছাচারের সঙ্গে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পার্থক্য এখানে যে, স্বেচ্ছাচারে ক্ষমতা

ক্রমাগত কেন্দ্রীভূত হয় এক ব্যক্তির হাতে। আর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতা বন্টিত হয় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে। সে কারণেই জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থার ভিত্তি তৈরি হবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক নিরপেক্ষতার ওপর। এক কথায় বলা হতো, রাষ্ট্রের তিনটি স্তম্ভ সংসদ, বিচারালয়, প্রশাসনের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক এবং ভারসাম্যমূলক সমন্বয় বজায় থাকবে। আর চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে থাকবে, প্রচার মাধ্যম-যা খুঁজে বের করবে সরকারের ত্রুটি, তুলে ধরবে জনগণের আকাঙ্ক্ষা। ফলে প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা এবং সক্ষমতা দুটোই থাকতে হবে। কেউ থাকবে না জবাবদিহির উর্ধ্বে। লেখার স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ধারণ করতে হবে। সংবাদ প্রচারের স্বাধীনতা খর্ব করা যাবে না এবং মিথ্যা ও চরিত্র হননমূলক লেখার শাস্তি থাকতে হবে। সমস্ত কিছুই হবে যাচাইযোগ্য এবং মানুষের গ্রহণ বর্জনের স্বাধীনতা থাকতে হবে। এসব প্রশ্নে একমত হলেও, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় টাকার ক্ষমতার কাছে সব কিছুই অসহায় হয়ে পড়ে। একদিকে গণতন্ত্রের কথা অধিকারের কথা বলে গণতন্ত্রের মহিমা তুলে ধরা হচ্ছে, অন্যদিকে সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করছে টাকাওয়ালারা। এই অসংগতি পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় দূর করা যাবে না। আবার সমাজের মুষ্টিমেয় মানুষের কাছে বেশিরভাগ মানুষ জিম্মি হয়ে পড়লে, গণতন্ত্র কথাটা অর্থহীন হয়ে পড়বে। এর ফল হবে মারাত্মক। মানুষ বিক্ষুব্ধ হবে, পাষ্টাতে চাইবে ব্যবস্থাকে। তাই সমাজে গণতন্ত্র চর্চা করতে হলে আইন, বিচার ও প্রশাসনের মধ্যে এক ভারসাম্য বজায় রাখার কথা বলা হয়েছিল।

ক্ষমতা বিভাজনের তত্ত্ব দিয়ে, সমাজে শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা করা হয়েছে। সবসময় সংস্কারের নামে আসলে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়। যেন স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থার লাগাম ধরা যায়। মানুষের বাক স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা করা যায়। কিন্তু সমাজের এই ভারসাম্য রক্ষিত হবে কোথায়? সংসদ হলো আইন তৈরির স্থান, কিন্তু সেই সংসদে যাওয়ার ক্ষমতা আছে কাদের? পার্লামেন্টে যাদের ক্ষমতা তারাই তো তৈরি করে, পরিচালনা করে প্রশাসন। ফলে ক্ষমতার দাপট থেকে বাঁচতে মানুষ যাবে কোথায়? এ ক্ষেত্রে বিচার বিভাগ হলো জনগণের শেষ ভরসার জায়গা। বিচারব্যবস্থার প্রতি আস্থা নষ্ট হলে, সমাজে ভারসাম্য রক্ষার কোনো উপায় থাকে না। বিচারব্যবস্থার প্রতি আস্থা তৈরির ক্ষেত্রে বিচারকের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই, কিন্তু বিচার বিভাগ শুধু বিচারকের ওপর নির্ভর

করে না। সরকার ও আইনজীবী এখানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

বিচারপতি নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি নির্ভর করে সরকারের সুনজরের ওপর। সিনিয়র ডিঙিয়ে বিচারপতির পদোন্নতির ঘটনা অনেক। সে কারণেই বিচার বিভাগের সংস্কার খুব প্রয়োজন। তা না হলে বিচারপতির পালিয়ে যাওয়া, বিচারপতির চেম্বারে হামলা, মব সৃষ্টি করে বিচারপতি অপসারণ, নির্দিষ্ট বলয়ের আইনজীবী হলে মামলায় দ্রুত জামিন পাওয়া, ক্ষমতা বলয়ের মধ্যে না থাকলে, সঠিক বিচার পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। অভ্যুত্থানের পর বিপুল প্রত্যাশা ছিল আদালত প্রাঙ্গণ থেকে দুর্নীতি, পক্ষপাতমূলক আচরণ আর দলবাজি দূর হবে। অন্তত এই একটা স্থান হবে স্বচ্ছ। আইনজীবীর রাজনৈতিক পরিচয় দিয়ে মামলার রায় প্রভাবিত হবে না। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের পুরো সময় কেটেছে, পাষ্টা প্রতিক্রিয়ার সময় হিসেবে।

আগের সরকারের আমলে যেমন হয়েছে, ওরা অত্যাচার করেছে, সমস্ত রকম সুবিধা নিয়েছে এখন আমাদের পালা। এমন কয়েকজন আইনজীবী হঠাৎ করে এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলেন যে তারা দাঁড়ালে, মামলায় বিজয় বা জামিন সুনিশ্চিত। ফলাফলে আবার হতাশা জেঁকে বসল। নির্বাচনের পর বিজয়ী দল বিএনপি জনপ্রত্যাশা এবং অঙ্গীকার পূরণ করবে, এটা আশা করা হয়েছে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় বিলুপ্ত করা সেই আকাঙ্ক্ষায় একটা শক্ত ধাক্কা দিয়েছে। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট বার নির্বাচন এবং চট্টগ্রাম বারের নির্বাচন, সেই পুরনো পথেই হাঁটার নজির তৈরি করল। গণতান্ত্রিক অধিকার বলতে আমরা কী বুঝি? অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাকে মৌলিক অধিকার বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। পুঁজিবাদী সমাজে সবকিছুই কেনা বেচার পণ্য। ফলে একেবারে অসহায় হয়ে ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের করুণা ভিক্ষা না করলে, সব কিছুই বাজার থেকে কিনতে হবে। কিন্তু মানুষের যদি কাজ না থাকে তাহলে তার আয় থাকে না, আর আয় না করলে ক্রয়ক্ষমতা থাকে না। তখন মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হলেও, মানুষ তা গ্রহণ করতে পারবে না। তাই কাজ পাওয়া এবং ন্যায়সংগত মজুরি পাওয়াটাকেও অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য করতে হবে। একই সাথে শুধু স্বীকার করলেই চলবে না, মৌলিক অধিকারের আইনি সুরক্ষাও থাকতে হবে। শুধু স্বীকৃতি দিয়ে পরিস্থিতির উন্নতি হয় না।

কথা বলার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা চলাফেরার স্বাধীনতা, সম্মান নিয়ে বাঁচার স্বাধীনতাসহ অন্যান্য বিষয়কে গণতান্ত্রিক

অধিকার বলে গণ্য করা হয়। ফলে যখন আমরা অধিকারের কথা বলি, তখন মৌলিক অধিকার এবং গণতান্ত্রিক অধিকার এই দুইয়ের সমন্বয়ে অধিকারের ধারণা তৈরি হয়। একটা রাষ্ট্র কতটা গণতান্ত্রিক, তা বোঝা যায় সে দেশের নাগরিকরা কতটা অধিকার ভোগ করেন তা দিয়ে। এই অধিকার পাওয়ার জন্যই এত আন্দোলন আমাদের।

মানুষ এবং সভ্যতা ইতিহাসকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলছে। ইতিহাস পেছনে টানে না বরং সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা এবং শিক্ষা দিয়ে যায় সবসময়। ইতিহাসের বেদনা, যন্ত্রণা, হাহাকার আর হতাশা শুধু নয় আনন্দও স্মৃতি হিসেবে মানুষকে ভাবায়। মনে করিয়ে দেয়, এই ছিল আমাদের অতীত যেখান থেকে আমরা এসেছি এখানে। সে কারণে ইতিহাসকে বলা যায়, পরিবর্তনের শিক্ষক। কিন্তু ইতিহাস নামক শিক্ষকের সবচেয়ে বড় শিক্ষা এই যে, ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা নেয় না। যে কারণে বারবার বলতে হয়, মনে করিয়ে দিতে হয় পূর্বসূরীদের জীবনটা দেখো, তাদের কার্যকলাপ খেয়াল করো, তাদের সাফল্যের শিক্ষা নাও আর ব্যর্থতাকে মনে রাখো। তাহলে সামনে এগিয়ে যেতে পারবে। পরিবর্তনের নিয়ম জেনে তাকে কাজে লাগাও। প্রকৃতি ও সমাজে একই ঘটনা একই রকমভাবে দবার ঘটে না। ঘটনার কিছুটা মিল থাকে, কিন্তু পুরোটা কখনো মেলে না। সময় কখনো পেছনে ফেরে না, এগিয়ে চলে ক্রমাগত। সে কারণেই মানুষের জীবন সামনে এগিয়ে যায় আর রেখে যায় স্মৃতি। খারাপ স্মৃতিগুলো যেন ভবিষ্যতের পথে কালো ছায়া না ফেলে, এইটুকু আশা কি করা ভুল হবে?

গণ আন্দোলনের পর দেশের মানুষ, ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে চেয়েছিল। এই প্রতীক্ষার কি শেষ হবে না? নারী, শিশু নির্যাতনকে যারা পোশাকের দোহাই দিয়ে, বাইরে বের হয়েছে কেন এই অভিযোগ দিয়ে লম্বু করতে চায় তাদের মানসিকতা কি সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে সহায়তা করবে? চূপ করে থাকার অর্থ এদেরকে প্রশ্রয় দেওয়া, তাই যারা কষ্ট পাচ্ছেন তাদের প্রতি আহ্বান। ক্ষুব্ধ হয়ে, হতাশ হয়ে আর বসে থাকা নয়। সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা এখন জরুরি। তা না হলে উন্নয়নের চমকের আড়ালে চাপা পড়ে যাবে মানুষের অধিকার। অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করতে হলে প্রতিবাদ প্রতিরোধের ধারাকে শক্তিশালী করতেই হবে। সরকার এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে জনগণ ছেড়ে কথা বলবে না। সমাজে স্বস্তি নিয়ে আসা সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

‘রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রভাষা বাংলা’ শীর্ষক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত

১১ পৃষ্ঠার পর

বাঙালীয় এবং এসবের পিছনে যে শক্তি ও সম্পদ ব্যয়িত হচ্ছে, পরিণতির পরিপ্রেক্ষিতে তা যুক্তিযুক্ত কিনা, জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতেই বা আমাদের কীভাবে তার মোকাবিলা করা উচিত।’ ...আমাদের দেশে মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রণালী বিচ্ছিন্ন, বৃহত্তর পৃথিবীর গতিশীলতার সঙ্গে যোগাযোগবিহীন একটি প্রণালী। এতে শিক্ষার্থীদের কুপমগ্ন করে তোলে।... আমাদের শিক্ষা জীবনে ইংরেজি কিন্ডারগার্টেন, মাদ্রাসা দুটি ক্ষতের মতো বিরাজ করছে।’

ইংরেজি মাধ্যমে পড়া অনেকে বাংলা লিখতে এবং পড়তে পারে না। মাদ্রাসা শিক্ষায় বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধন ও নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিকাশে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। এর সাথে যুক্ত যুবসমাজ আজ পঙ্কু শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দিশাহীন পথে হাটছে। সাধারণ শিক্ষার মানও ক্রমাগত নিচে নামছে। প্রতিবছরের ফেব্রুয়ারি একটি মাসে

বই কেনাবেচা ও ভাষাকেন্দ্রিক তৎপরতার বাইরে সারা বছরব্যাপী তার প্রাতিষ্ঠানিক অপ্রাতিষ্ঠানিক তেমন তৎপরতা দৃষ্টিগোচর থাকে না। বাংলা একাডেমি অনেক কাজ করেছে এবং করে চলেছে কিন্তু তা সার্বিক বিচারে সময়ের বিবেচনায় যথেষ্ট নয়।

আমাদের ভাষা আমাদের জাতি পরিচয়ের ভিত রচনা করেছে। ধর্মভিত্তিক কৃত্রিম জাতীয়তা থেকে ভাষাভিত্তিক আত্মপরিচয়ের সোপান তৈরি করে মহান মুক্তিযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। আমাদের ভাষা আন্দোলনে আত্মোৎসর্গের বিশেষ দিনটি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি লাভ করেছে। অথচ স্বাধীনতার ৫৫ বছর পরেও নিজস্ব মাতৃভাষার দৈন্যদশা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। জ্ঞান বিকাশের ও প্রকৃত আর্থিক-মানসিক, মানবিক সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করতে পারিনি। সেই উপলব্ধি দেশবাসী বিশেষ করে যুবসমাজের সামনে হাজির করা সময়ের দাবি।

ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের সীমান্তে পুশ-ইন বন্ধ ও আলোচনার মাধ্যমে সংকট নিরসন কর



ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের বিভিন্ন সীমান্তে পুশ-ইন বন্ধ ও সংকট নিরসনের দাবিতে বাসদ রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ১০ জুন শহরের প্রেসক্লাব চত্বরে মানববন্ধন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সদস্যসচিব মমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য দেন মাজেদুল ইসলাম দুলাল, মিজানুর রহমান ও যুগেশ ত্রিপুরা।

‘রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রভাষা বাংলা’ শীর্ষক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত

রাষ্ট্রভাষা বাংলা রক্ষা কমিটির উদ্যোগে ১৩ মে '২৬ বাংলা একাডেমির ড. মুহাম্মদ এনামুল হক ভবনে অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের সভাপতিত্বে ‘রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রভাষা বাংলা’ শীর্ষক এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাসদ-এর উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা কমরেড খালেদুজ্জামান। বিশেষ আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা নঈম জাহাঙ্গীর, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. নাজিম উদ্দীন আহমেদ, সিনিয়র সাংবাদিক আবু সাঈদ খান, সিনিয়র সাংবাদিক সোহরাব হাসান, গীতিকবি শহীদুল্লাহ ফরায়জী, সাবেক এমপি শফিকুল ইসলাম, সাবেক ছাত্রনেতা আসাদুর রহমান খান, ভাষাসৈনিক রফিকের ছোট ভাই খোরশেদ আলম, শহিদ বরকতের ভতিজা আইনউদ্দীন বরকত, স্বদেশ চিন্তা সংঘের সাধারণ সম্পাদক কবি হাসান ফকরী, উর্দুভাষী সংখ্যালঘু কাউন্সিল এর সাধারণ সম্পাদক আফজাল ওয়াসী, নাগরিক ভাবনার আহ্বায়ক মো. হাবিবুর রহমান, রাষ্ট্রভাষা বাংলা রক্ষা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মোজাম্মেল



হোসেন মোহন, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সভাপতি নিখিল দাস। সভা পরিচালনা করেন সোনার বাংলা পার্টির সভাপতি ও রাষ্ট্রভাষা বাংলা রক্ষা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ হারুন অর রশীদ।

কমরেড খালেদুজ্জামান বলেন, মাতৃভাষা

একটি জাতির অস্তিত্বের শেকড়। মানবজাতির যা কিছু সৃষ্টি ও নিজেদের অর্জনসমূহ তা মাতৃভাষায় হয়ে উঠে জীবনবৃক্ষের কাণ্ড, শাখাপ্রশাখা, পত্র-পুষ্প, ফলে-ফুলে সুশোভিত সজীববৃক্ষ।

আমাদের স্বাধীনতার ৫৫ বছর পরও সেদিক থেকে দেখলে আমরা আধমরা, শুকনো ডালের

পাতা ঝরা গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। উচ্চতর জানে—তা চিকিৎসাবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, কারিগরিবিদ্যা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই মাতৃভাষায় সৃষ্টি বা অনুদিত হওয়ার অভাবে সাবলীল প্রবাহমান হয়ে উঠতে পারেনি। তাই আমরা জানে এবং সমৃদ্ধি অর্জনে পরমুখাপেক্ষি হয়ে আছি।

শহিদ বুদ্ধিজীবী মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী লিখেছিলেন, ‘ধর্মের মিথ্যা দোহাই দিয়ে তাঁরা আলোকের পথ, শিক্ষা ও প্রগতির পথ আমাদের সম্মুখে রুদ্ধ করে রেখেছে, আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে।’ কথায় বলে, ‘ভূতের পা পিছন দিকে হাটে’। আর এক শহিদ বুদ্ধিজীবী মোহাম্মদ মোর্তজা লিখেছিলেন, ‘আমাদের দেশে এই যে তিন ধরনের বিদ্যালয় (সাধারণ, ইংলিশ মিডিয়াম ও মাদ্রাসা) প্রতিষ্ঠিত আছে, তাদের মধ্যকার পার্থক্য পদ্ধতি ও ভাষাগত নয়, অনেকাংশে বিষয়গতও বটে। সেজন্য সর্বশেষ পরিণতিতে তারা সাধারণভাবে পৃথক ধরনের ব্যক্তিতে পরিণত হয়। আমাদের অনুধাবন করতে হবে এই পার্থক্যের কতটুকু এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

কমরেড শাহজাহান তালুকদার স্মৃতি সংসদ ও পাঠাগার উদ্বোধন

বাসদ চাঁদপুর জেলার সাবেক আহ্বায়ক কমরেড শাহজাহান তালুকদারের স্মৃতি রক্ষার্থে ‘কমরেড শাহজাহান তালুকদার স্মৃতি সংসদ ও পাঠাগার’ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় ১১ এপ্রিল ২০২৬। উদ্বোধন ঘোষণা করেন কমরেড শাহজাহান তালুকদারের মা জোহরা বেগম। বাসদ চাঁদপুর জেলার সমন্বয়ক দিপালী রানীর সভাপতিত্বে ও জেলা কমিটির সদস্য আব্দুর রহিমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা কমরেড খালেদুজ্জামান। আরও বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সাংবাদিক শ্যামাপদ ঘোষ ভুলু, বাম রাজনীতিক আলমগীর হোসেন দুলালসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানে কমরেড শাহজাহান তালুকদারের পরিবারের সদস্যবৃন্দ ও পার্টির বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মী, সমর্থক-শুভানুধ্যায়ীগণ উপস্থিত ছিলেন।

কমরেড খালেদুজ্জামান বলেন, কমরেড শাহজাহান তালুকদার ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ বিপ্লবী নেতা। আমৃত্যু তিনি এদেশে শ্রমজীবী-মেহনতি মানুষের মুক্তির আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। নিজের ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিষ্ঠা, সুখস্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করার সব সুযোগ থাকার পরও তিনি এই জীবন বেছে নেননি। তিনি নিয়েছিলেন মানবমুক্তির সংগ্রামের কষ্টকাকীর্ণ পথ। বর্তমানের চরম আত্মকেন্দ্রিক সমাজে নিঃস্বার্থবোধে বলিয়ান আজীবন বিপ্লবী কমরেড শাহজাহান তালুকদারের মহতি জীবনের শিক্ষা গ্রহণ করে আগামী দিনে শ্রমিকশ্রেণির পার্টি বাসদকে শক্তিশালী করা এবং পুঁজিবাদী-ভোগবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের সংগ্রামকে বেগবান করতে হবে।

এখানে যারা আলোচনা করেছেন, তাদের অনেক যুক্তিসংগত কথা, অনেক প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা মনে আছে। আজকে সেগুলো নিয়ে কথা বলার সুযোগ নেই; তবে সেগুলি নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। পরবর্তীতে যখন রাজনৈতিক আলাপআলোচনা হবে, সাংগঠনিক সভা হবে, সেখানে আপনাদের জিজ্ঞাসার কথা গুলো আলোচনা হবে। কমরেড শাহজাহান তালুকদারের গোটা পরিবার আন্দোলন সংগ্রামের



সাথে যুক্ত। আজ তার পরিবারের ছোট-বড় সকলে এসেছেন এবং অন্যান্য পরিবারেরও সকল বয়সের সদস্যরা এখানে এসেছেন। এটা একটা নতুন আশার সঞ্চার করে। এ অনুষ্ঠানটা ছোট হলেও তা গোটা দেশের মানুষের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে, আশা জাগায়। কারণ দেশে এখন হতাশারকাল চলছে। অভাবঅনটন, দারিদ্র্য-বেকারত্ব, খুন-ধর্ষণ, হত্যা অনেক সংকট আছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় সংকট হচ্ছে উন্নত চরিত্রের সংকট, নীতি-আদর্শের সংকট। মানুষ না খেয়েও লড়তে পারে যদি নৈতিক বল থাকে। এর অনেক ইতিহাস আছে; ভিয়েতনাম তার উদাহরণ। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তার চেয়ে ব্যতিক্রম কিছু নয়।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধটা ছিল জনযুদ্ধ। নেতৃত্ব আওয়ামী লীগ দিয়েছিল কিন্তু যুদ্ধটা আওয়ামী লীগের ছিল না। যদিও পরবর্তীকালে এটাকে আওয়ামী লীগের যুদ্ধ বানিয়ে ফেলা হয়েছিল। ২৫ মার্চ পাকিস্তানিরা যখন হামলা শুরু করে এর মোকাবিলার প্রস্তুতি ছিল না। আর্মি-ইপিআর, পুলিশ তাদের হাতে অস্ত্র ছিল সেটা দিয়ে তারা লড়াই শুরু করেছিল। এপ্রিলের মাঝামাঝি তাদের সব গোলাবারুদ শেষ হয়ে যায় এবং তারা ভারতে চলে যান। আন্দোলনের নেতা শেখ মুজিব বন্দি হয়ে কারাগারে, আওয়ামী লীগ সরকার ভারতে-আর দেশে চলছে গণহত্যা। মুক্তিবাহিনীরা ট্রেনিং নিয়ে দেশে ফিরে এসেছিল জুন মাসে। ফলে, মার্চ থেকে জুন ৪ মাস গণহত্যা চলছে। তখন সশস্ত্র শক্তিকে প্রতিরোধ

করেছিল নিরস্ত্র জনগণ। এ কারণেই এটা জনযুদ্ধ।

একদল মুক্তিযুদ্ধকে সাইনবোর্ড বানিয়েছিল এখন পরাজিত শক্তি মুক্তিযুদ্ধকে কালিমালিঙ্গ করে চলছে। এর কোনোটাই সফল হবে না।

এখন দুনিয়াব্যাপী একটা সংকট চলছে। আমেরিকা গণতন্ত্রের জয়গান করে। আমেরিকার অর্থনৈতিক অবস্থা চরম খারাপ। প্রায় ৪০ ট্রিলিয়ন ঋণ। তার জিনিসপাতি বিক্রি হয় না। সে কারণে বিভিন্ন দেশে টেক্স আরোপ করে এগুলো বিক্রি করছে। আর ট্রাম্প এখন দস্যুতা করছে। একটা দেশের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট এবং তার স্ত্রীকে শোয়ার ঘর থেকে তুলে নিয়ে এসেছে। কারণ, তেল লুট করতে। ইরানের ধর্মীয় নেতাসহ তাদের প্রথম সারির সকল নেতাকে হত্যা করেছে। এখানেও উদ্দেশ্য তেল লুট। আমেরিকার প্রধান ব্যবসা অস্ত্র ব্যবসা এখন সেটা কমছে। ডলারের কর্তৃত্ব দুর্বল হচ্ছে। আমেরিকায় এখন সমাজতন্ত্রের সমর্থন বাড়ছে।

আমাদের দেশে এখন ধর্মের নামে মানুষকে বিভ্রান্ত করে চলছে। ইতিহাসের চেতনা দুর্বল হওয়ার কারণে আজকে তারা মানুষকে বিপথ গামী করার সুযোগ পাচ্ছে। বিভ্রান্তি বেশি দিন টিকে না। আপনারা এখানে এসেছেন আদর্শগত চেতনায়, নৈতিকতার চেতনায়, শোষণমুক্তির চেতনার স্বীকৃতি দিতে। আপনারা সম্মান জানাতে এসেছেন এমন একজনকে যে সারাজীবন এর জন্য লড়াই করে গেছে। এটা ই

জাতির ভরসা। কমরেড শাহজাহানের পরিবারের সাথে অনেক আগে থেকেই আমরা ঘনিষ্ঠ ছিলাম। তারা দলের পক্ষে অনেক ভারবোঝা নিয়েছে, কষ্ট করেছে, দায়িত্ব পালন করেছে। সেগুলো একটা জীবন্ত প্রেরণা। যারা রাজপথে স্লোগান দেয় তারা একা নয়, তাদের সাথে পরিবারের নারীপুরুষ সদস্যরা আছে, শিশু-কিশোর, বয়স্করা আছে।

যে চেতায় দেশ স্বাধীন হয়েছে মানুষ তা ধারণ করে কিন্তু আজ সে চেতনা ভুলিয়ে দিয়ে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি তাদের কায়মি স্বার্থ বাস্তবায়িত করতে চায়। তারা এটা পারবে না। কারণ দীর্ঘদিন মানুষকে বিভ্রান্তিতে রাখা যায় না।

যে শক্তি এই অবস্থার পরিবর্তন করবে তাদের কিছু ঘাটতি আছে সেটা পূরণ করতে হবে। মানুষ যখন দুর্গমগিরি পাড়ি দেয় তখন নানা ধরনের চড়াই-উতরাই পাড়ি দিতে হয়। ইতিহাস কখনও সরল পথে চলে না। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ফ্রন্টে যে পরিস্থিতিগুলো এসে হাজির হয় সব সময় তাকে সঠিকভাবে মোকাবিলা করা যায় না। কিন্তু এই পথেই মানুষ একদিন সঠিক রাস্তা খুঁজে পায়।

এখানে পাঠাগার হয়েছে। রাজনৈতিক চেতনাকে উজ্জীবিত করতে সাংস্কৃতিক চেতনা লাগে। আবার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডও একটা চলতে পারে না। একলা চলতে গেলে সে পিছিয়ে যায়। সামনে এগোতে হলে এই দুইয়ের মেলবন্ধন ঘটাতে হয়। আপনারা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন তাদের সবাইকে অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা জানাই।

আলোচনাসভা শেষে কমরেড শাহজাহান তালুকদার স্মৃতি সংসদ ও পাঠাগারের নবনির্বাচিত কমিটি পরিচয় করিয়ে দেন কমরেড খালেদুজ্জামান। সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন অ্যাডভোকেট মাসুদ রানা, সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান। সদস্য-শ্যামাপদ ঘোষ ভুলু, আলমগীর হোসেন দুলাল, দিপালী রাণী, আব্দুর রহিম, মিজানুর রহমান, অ্যাড. শীতল চন্দ্র ঘোষ, নুরুল কাদের মানিক, অ্যাড. বিধুভূষণ নাথ পলাশ, পলাশ দাস, রুহুল আমিন, আমিনুল ইসলাম, নিশেধ নারায়ন মজুমদার, নুর মোহাম্মদ গাজী, সাদাম হোসেন ও মাস্টারউদ্দিন শাওন।

জাতীয় বাজেটে কৃষি খাতে উন্নয়ন বরাদ্দের ৪০ ভাগ বরাদ্দের দাবি

শেষ পৃষ্ঠার পর

কোনো আয়ের উৎসও। এই কাজ না থাকার সময়টা ন্যূনতম ১২০ দিন বা তারও বেশি হয়ে থাকে। তখন এরা বেকার সময় কাটাতে বাধ্য হয় বা অন্য কোনো অস্থায়ী কাজে কম মজুরিতে কাজে যুক্ত হয়।

তিনি বলেন, কৃষকের ঋণনির্ভরতা ও অস্বাভাবিক বেশি সুদের জাল কৃষকের গলায় ফাঁস হয়ে আছে। কৃষকের হাতে উৎপাদনের জন্য পুঁজি বলতে কিছুই থাকে না। তাদের আবাদ গুরুই করতে হয় ঋণের টাকা দিয়ে। যেদিন তারা এনজিও-এর কাছ থেকে ঋণ নেয় তার ৭ দিন পরেই প্রথম কিস্তি পরিশোধ করতে হয়। অথচ তখন সবেমাত্র বীজ রোপন গুরু হয়েছে। ওই ফসল ওঠতে সময় লাগে আড়াই হতে তিন মাস; এই সময়ের মধ্যে তাকে ন্যূনতম ১০ সপ্তাহের কিস্তির টাকা শোধ করতে হয়। বাধ্য হয়ে কৃষক কিস্তির টাকা শোধ করতে অন্য আরেক এনজিও থেকে ঋণ নেয়। এইভাবে কৃষকের জীবনে এনজিও ও মহাজনি চক্রে বাধা পড়ে যায়। ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (ইফপ্রি) এক সমীক্ষায় বলে, বাংলাদেশের কৃষকদের ৮১ শতাংশের বেশি ঋণ আসে বেসরকারি উৎস থেকে—এনজিও, আত্মীয়স্বজন, দাদন ব্যবসায়ী ও বেসরকারি ব্যাংক। এগুলোর সুদের হার ১৯ থেকে ৬৩ শতাংশ পর্যন্ত হয়। অথচ কৃষি ব্যাংক থেকে পাওয়া ঋণের সুদ মাত্র ৯ শতাংশ, কিন্তু তা পান খুব অল্প সংখ্যক কৃষক—মাত্র ৬ শতাংশ ঋণ আসে কৃষি ব্যাংক থেকে। ব্যাংক ঋণের বড় অংশ পান ধনী কৃষক (প্রায় ১৫ শতাংশ); বড়, মাঝারি ও ছোট চাষি পান ৩৬ শতাংশ; প্রান্তিক দরিদ্র চাষি পান মাত্র ৫ শতাংশ; আর বর্গাচাষি তো ব্যাংক ঋণই পান না—জমির কাগজপত্র ও বন্ধক (Mortgage) দিতে না পারার কারণে। ফলে বর্গাচাষি এনজিও বা মহাজনের কাছে যেতে বাধ্য হন। বেসরকারি ব্যাংকগুলোর কৃষি ঋণ দেওয়ার

কথা থাকলেও তারা কৃষকদের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রহী হয় না বা সরকারের সিদ্ধান্ত মানে না।

কমরেড ফিরোজ বলেন, বাংলাদেশে পর্যাপ্ত কৃষিজাত কাঁচামাল ও জনশক্তি থাকার পরও কৃষিভিত্তিক শিল্প ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠায় সরকার উদাসীন। চাহিদার চেয়ে বেশি মৌসুমি ফল ও সবজি উৎপন্ন হয় কিন্তু সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের অভাবে বেশির ভাগ নষ্ট হয় ও কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। যদি এই প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠা করে; কৃষিপণ্যকে ভৌত বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ, প্যাকেটজাত ও উন্নত মানের পণ্যে রূপান্তর করা যায়, তা হলে কৃষি ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে, কৃষক লাভবান হবে ও বেকার যুবকের কর্মসংস্থান তৈরি করবে কিন্তু সরকারের এ ব্যাপরে কোনো পরিকল্পনা নেই, বাজেটে বরাদ্দও থাকে না।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ ও সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট প্রথম বয়স্ক ভাতার দাবি উত্থাপন করেছিল। তখন সরকার এ দাবির প্রতি কর্ণপাত করেনি। আমরা বলেছিলাম—টোকিদার থেকে রাষ্ট্রপতি ও সামরিক বেসামরিক আমলা, কর্মকর্তা-কর্মচারী পেনশন পান কিন্তু যারা যৌবনে রোদে পুড়ে-বৃষ্টিতে ভিজে, প্রচণ্ড শীতকে উপেক্ষা করে ফসল ফলিয়েছেন, শ্রম দিয়েছেন, তাদের বৃদ্ধকালে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হবে কেন? কৃষকের জন্য মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা না গেলে কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা স্থায়ী ভিত্তি পাবে না। সরকারি কর্মচারীদের অনুরূপ অবসর ভাতা কৃষক-খেতমজুর ও কৃষি শ্রমিকদের দিতে হবে। সরকার ১৯৯৭ সালে বয়স্ক ভাতা চালু করলেও যার পরিমাণ—সংখ্যায় ও অর্থে অন্ধে ছিল নগণ্য। এখন জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ায় গ্রাম-শহরের প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তিকে কমপক্ষে ৫ হাজার টাকা বয়স্ক ভাতা দিতে হবে।

এছাড়া, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে এ, বি, সি ক্যাটাগরির রেশনিং ব্যবস্থা চালু থাকলেও অতীতের সরকার তা বন্ধ করে দিয়েছে। এখন সেনাবাহিনী-পুলিশ, র‍্যাব-বিজিবি, আনসাররা নামমাত্র মূল্যে রেশন পাচ্ছে। আমরা দাবি জানাই—গ্রাম-শহরের শ্রমজীবী মানুষের জন্য ‘আর্মি রেটে’ রেশনিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে। কারণ, যারা মাঠে ফসল ফলায়, কারখানায় পণ্য উৎপাদন করে, সেবা খাতে শ্রম দেয়, তাদের মুখে কেন আহার থাকবে না।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের ধানের শতকরা ৬০ শতাংশ আসে বোরো মৌসুম থেকে। আমরা দাবি করছি কমপক্ষে ৫০ লাখ টন ধান উৎপাদন খরচের সাথে ৪০% বেশি দিয়ে খোদ কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি কিনতে হবে। প্রতিটি ইউনিয়নে ক্রয়কেন্দ্র খুলতে হবে। সরকার বর্তমানে ৩৬ টাকা প্রতি কেজি (১,৪৪০ টাকা প্রতি মণ) ধানের ক্রয়মূল্য নির্ধারণ করলেও সময়মতো না কেনার ফলে বাজারে ৭০০-৮০০ টাকায় ধান বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন কৃষক। নির্ধারিত মান (অর্দ্দতা ১৪%, বিজাতীয় পদার্থ ০.৫%, ভিন্ন জাতের ধানের মিশ্রণ ৮%, অপুষ্ট ও বিনষ্ট দানা ২%, চিটা ০.৫%) কৃষক পূরণ করলেও কর্মকর্তারা নানা অজুহাতে হয়রানি করেন। ফলে কৃষক লোকসান দিয়ে খোলা হাটেবাজারে ধান বিক্রি করতে বাধ্য হন। হাওরে অকাল বন্যার কারণে কৃষকের ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে তাই দ্রুত তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং ঋণের সুদ সম্পূর্ণ মওকুফ করতে হবে এবং সরকারি উদ্যোগে বিনাশর্তে ঋণ প্রদান করতে হবে।

তিনি বলেন, দেশের পাহাড় ও সমতলে প্রায় ৫০টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বসবাস করে। কিন্তু তাদের ভূমির মালিকানা নেই। চিরায়ত প্রথা ‘সমষ্টিগত মালিকানা’ আইএলও কনভেনশন ১০৭ ও ১৬৯-এ স্বীকৃত। দলিল থাকুক বা না থাকুক, আদিবাসীরা যে জমি ঐতিহ্যগতভাবে ব্যবহার করে, তা তাদের। বাংলাদেশ সরকার আইএলও

কনভেনশন ১০৭-এ স্বাক্ষর করলেও তা আইনে পরিণত করেনি। আদিবাসীদের ভূমির অধিকার নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে।

তিনি বলেন, দেশের বর্তমান বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া ত্রুটিপূর্ণ। বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য-চিকিৎসা, খাত অগ্রাধিকার পাওয়া যৌক্তিক হলেও সেটা উপেক্ষিত। শাসক দলগুলো জনগণকে কথায় ও প্রতিশ্রুতিতে তুষ্ট করতে চায়, গ্রামীণ ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মতামত ও চাহিদা বাজেটে প্রতিফলিত হয় না। সচিবালয়ের এসি রুমে বসে আমলা ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থে বাজেট তৈরি হয়, ক্ষমতাসীন দলের ইচ্ছায় চলে। এ কারণে ৫৫ বছর পরও জনগণের গণতান্ত্রিক বাজেট হয়নি। ক্ষেতমজুরদের সারাবছর কাজ ও খাদ্যের নিশ্চয়তা বিধানের দাবি করে তিনি বলেন, খাদ্য অধিকার ও ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করতে বাজেটে বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

তিনি বলেন, কৃষক ৫-১০ হাজার টাকা ঋণ নিতে গেলে ব্যাংকে হয়রানি ও ঘৃষ দিতে হয়। বন্যা-খরায় ফসল নষ্ট হলে তারা ঋণ শোধ করতে পারে না, তখন তাদের নামে সার্টিফিকেট মামলা হয়, কোমরে দড়ি দিয়ে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ৬৮ হাজার কৃষকের নামে এখন সার্টিফিকেট মামলা ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে। সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার ও সরকার ঘোষিত ১০ হাজার টাকা কৃষি ঋণ মওকুফের প্রতিশ্রুতি দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

সব শেষে কৃষি-কৃষক, খেতমজুর-আদিবাসী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা দেওয়া তথা বাংলাদেশ বাঁচাতে জাতীয় বাজেটে উন্নয়ন বরাদ্দের শতকরা ৪০% বরাদ্দ করার দাবি করে কমরেড ফিরোজ এই দাবিতে সারাদেশের কৃষক, খেতমজুর-আদিবাসীসহ সর্বস্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

হামে মৃত্যুর বেদনা আর বেঁচে থাকার যন্ত্রণা

হামের ভয়াবহতা নিয়ে দায় চাপানো বন্ধ কর

নানা রাজনৈতিক উত্তেজনা আর বিশ্বকাপ ফুটবলের উন্মাদনায় যেন আড়াল হয়ে যাচ্ছে হাম নিয়ে দুর্ভাবনা। কিন্তু মাত্র তিন মাসে সাড়ে ছয়শ শিশুর মৃত্যু এর আগে কখনো দেখেনি বাংলাদেশ। অসহ্য যন্ত্রণায় যখন মানুষ কাতরাতে থাকে, অসহায় স্বজন যখন দেখে সাহায্য করার কেউ নেই, কোন উপায় নেই যন্ত্রণা লাঘব করার তখন দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে একটা কথা বেরিয়ে আসে এই মৃত্যু যন্ত্রণার চাইতে মৃত্যুই ভালো। কিন্তু বাবা মা’র ক্ষেত্রে এই কথা চলে না। যন্ত্রণাকাতর মানুষের দিকে তাকিয়ে সন্তানের অসুস্থতা সব বাবা মাকেই অস্থির করে তোলে। কোথায় যাবেন, কার কাছে যাবেন, কী করলে তাদের সন্তান সুস্থ হয়ে উঠবেন এই ভাবনায় যে কোন বুকিই তাঁরা নিতে পারেন। কিন্তু যখন প্রশ্ন দাঁড়ায় টাকার এবং চিকিৎসা সামগ্রীর তখন বুকফাটা হাহাকার নিয়ে শুরু হয়ে যান তাঁরা। চোখের সামনে ধীরে ধীরে সন্তানের মৃত্যু তাকে পাথর বানিয়ে দেয়। গত দুই মাস ধরে এমন বাবা মাকে দেখছে আমাদের দেশ। জেলা শহরের হাসপাতালে আর ঢাকার হাসপাতালে মৃত শিশুকে জড়িয়ে বুকে শোকের পাহাড় আর অশ্রু বিহীন শুষ্ক চোখে বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন দরিদ্র বাবা মা। এই মায়েরা সন্তান জন্ম দেওয়ার যন্ত্রণা অনুভব করলেন কিন্তু সন্তানের মুখে মা বাবা ডাক শোনার সুখ পেলেন না। বুক ভরা হাহাকার নিয়ে তাঁরা চলে যাচ্ছেন কিন্তু প্রশ্ন রেখে যাচ্ছেন, এই

মৃত্যুর জন্য দায়ী কে?

গত ১৫ মার্চ থেকে হাম এবং হামের উপসর্গে দেশে ৬৫০ এর বেশি শিশুর মৃত্যু হয়েছে এবং প্রতিদিন এই সংখ্যা বাড়ছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, চলতি বছরের ১৫ মার্চ থেকে হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৬৮ হাজার ৯৩৪ জন শিশু। তবে এটাই সত্যিকারের তথ্য নয়। বাস্তব পরিস্থিতি এর চেয়েও ভয়াবহ বলে মনে করেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। কারণ দেশের সরকারি হাসপাতালের অপ্রতুলতা প্রায় ৬৫০টি, যেখানে চিকিৎসার জন্য যাওয়া এবং চিকিৎসা সেবা পাওয়া কঠিন। আবার বেসরকারি হাসপাতাল ৫ হাজার ৫০০ এর মতো, সেখানে চিকিৎসা নেয়ার সামর্থ্য সকলের নেই। ফলে এটা ধারণা করা যায় যে, বিপুল সংখ্যক শিশু হাসপাতালে যাওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করেছে যার হিসাব বাবা মা ছাড়া সরকারের কাছে কখনই আসবে না।

একটা বিষয় খুবই ভাবনার উদ্রেক করে। হামে শিশু মৃত্যুর জন্য দায়ী কে, দায়ী কী এবং ঘাটতি কী এই আলোচনায় প্রথমেই আসে আইসিইউ, পিআইসিইউ, ভেন্টিলেটর, লাইফ সাপোর্ট নেই। কিন্তু এই প্রশ্নটা তো জরুরি যে কেন একটা শিশুকে এই পর্যায়ে যেতে হচ্ছে যখন তার ভেন্টিলেটর প্রয়োজন? একজন বাবা মাকে যখন সাত আটটা হাসপাতাল ঘুরে ঢাকায় আসতে হয় ততক্ষণে শিশুর জীবনীশক্তি এবং রোগ প্রতিরোধ

ক্ষমতা একেবারে শেষ পর্যায়ে। এরকম সময়ে ভেন্টিলেটর পেলেও বাঁচানো কঠিন আর না পেলে মৃত্যুর অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। ফলে শেষ মুহূর্তের চিকিৎসার পরিবর্তে যদি জ্বর, শ্বাস কষ্ট বা হাম দেখা দিলে স্থানীয় পর্যায়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকতো তাহলে মৃত্যুর সংখ্যা কমানো যেত। আর একটি বেদনাদায়ক সত্য হলো দরিদ্র পরিবারগুলো সহজে হাসপাতালে আসতে চায় না। তাদেরকে সহজে হাসপাতালের ডাক্তার-নার্স, চিকিৎসা কর্মী কেউ গুরুত্ব দেয় না, চিকিৎসার খরচ, যাওয়া আসার খরচ আর নিজের আয় রোজগার বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে একেবারে শেষমুহর্ত ছাড়া তাঁরা হাসপাতালে আসে না। আবার মায়েরদে স্বাস্থ্য এতটাই খারাপ থাকে যে প্রয়োজনীয় বুকের দুধও সন্তান পায় না। ফলে এগুলো বিবেচনায় না নিয়ে শুধু ভেন্টিলেটর বাড়ালে সমস্যার সমাধান হবে না। বরং একটি ভেন্টিলেটরের খরচে শতাধিক শিশুর জন্য অক্সিজেন সাপোর্ট ও কমিউনিটিভিত্তিক চিকিৎসা দেয়া সম্ভব।

টিকা দেওয়ার গাফলতি বা দায়হীনতা শিশু মৃত্যুকে বাড়িয়ে তুলেছে। স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সরকার ও বেসরকারি সংস্থা বা এনজিওগুলোর ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ বিশ্বে টিকাদান কর্মসূচিতে সুনাম অর্জন করেছে। ফলে যার হয় যক্ষ্মা তার নেই রক্ষা এই ধরনের ভীতিকর স্লোগান এখন আর শোনা যায় না।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও), ইউনিসেফসহ বিদেশি অনেক আর্থিক ও কৌশলগত সহায়তা শিশুমৃত্যু কমাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। এর কৃতিত্ব যারই থাক সাফল্যের দাবিদার হয়েছে সকল সরকার।

কিন্তু সাফল্য যেভাবেই আসুক তার মোহ যে অসতর্ক করে তোলে তার নজিরও আছে। বাংলাদেশের টিকাদান কর্মসূচিতে সাফল্য থাকলেও নানা সময়ে বিভিন্ন স্থানে হামের প্রাদুর্ভাবের ঘটনা ঘটেছিল। ২০১৭ সালের জুলাই মাসে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের পাহাড়ি এলাকায় একটি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে হামের প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়েছিল, সেখানে ৯টি শিশু মারা গিয়েছিল। তখন দুর্গম অঞ্চলে টিকাদান কর্মসূচির ঘাটতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। সীতাকুণ্ডের সেই হামে শিশু মৃত্যুর ঘটনায় সতর্ক হয়নি সরকার ফলে ২০২০ সালের মার্চ মাসে পার্বত্য চট্টগ্রামে হামের প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়ে তখনও সেখানে ৯টি শিশু মারা গিয়েছিল।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) ডেটাবেস থেকে দেখা গেছে, ২০১৭ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত দেশে হামের টিকার প্রথম ডোজ দেওয়ার হার ছিল প্রতিবছর ৯৭ শতাংশ। এরপরও গত এক যুগে এ কয়েক বছরে সবচেয়ে বেশি আক্রান্তের ঘটনা ঘটে। ২০১৭ সালে ৪ হাজার, ২০১৯-এ প্রায় ৬ হাজার আর বাকি দুই বছরে **এর পর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১**

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে অসম বাণিজ্য চুক্তি বাতিল কর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাতিল করলো সেটা মার্কিন ব্যবসায়ীরা পালটা শুদ্ধ নীতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেজন্য মামলা করেছিল বলে। বাংলাদেশ সরকার জুন ’২৫ সালে গোপনীতার চুক্তি করে, সেটা ফাঁস করে দেওয়ায় এনবিআরের একজন কর্মকর্তাকে বরখাস্ত ও জেলে পুরেছিল। এর অজুহাতেই সরকার চুক্তি জনসম্মুখে প্রকাশ করছে না। চুক্তি এখনও রেটিফাই হয়নি; তার আগেই ক্রয় চুক্তি করা হচ্ছে। জ্বালানি বিষয়ে যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে তাতে মার্কিনের জ্বালানি আধিপত্য রক্ষার কথা বলা হয়েছে। এখন নতুন করে সমুদ্রে গ্যাস অনুসন্ধান-উত্তোলনের জন্য টেন্ডার হয়েছে, ১৫ মে যে জ্বালানি সমঝোতা স্মারক সেই করেছে তার মাধ্যমে বিদেশি কোম্পানি লাভবান হবে।

তিনি বলেন, ভারতীয় আধিপত্য বন্ধ করার দাবিতে মানুষ স্লোগান দিয়েছে এখন মার্কিন আধিপত্য তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন, প্রথমে চুক্তি বাতিল করতে হবে। নীতি প্রণয়নে আমাদের বিশেষজ্ঞদের যুক্ত করতে হবে।

সোহরাব হোসেন বলেন, অনেকে মনে করেন বামেরা বিভক্ত, শক্তি নাই, সংসদে নাই কিন্তু জনগণের পক্ষে জাতীয় স্বার্থে বামেরাই রাজপথে সোচ্চার আছে। অতীতেও ছিল, এখনও আছে। তিনি বলেন, এই চুক্তি অধীনতার, দাসত্বের, এটা মানা যাবে না। বর্তমানে সরকারি দল বিরোধী দল সবাই এক, সেটা হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অখুশি হবে এমন কিছু করা যাবে না। প্রমাণ এক বেসরকারি ব্যাংক নিয়ে মূলতবি প্রস্তাবে সংসদে এক ঘন্টা আলোচনা হয় অথচ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বাঁচামরার সমস্যা যেখানে সেই বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে বিএরপি, জামায়াত, এনসিপি কেউ কথা বলছে না। তিনি বলেন, একজন উপদেষ্টা বলেছেন চুক্তির আগেই বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে খাদ্য মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেওয়া হয়েছিল আমেরিকা থেকে গম কেনার জন্য। আমেরিকা

তো চীনের উপরও ১৪৫% শুদ্ধ আরোপ করেছিল কিন্তু পরে তা কমাতে বাধ্য হয়েছে।

জনাব আবু তাহের খান বলেন, এটাকে বাণিজ্য চুক্তি না বলে কর্পোরেট পুঁজি চালিত রাজনৈতিক চুক্তি বলাই ভালো। এই চুক্তির ফলে আমাদের কৃষি ধ্বংস হবে, শিল্প গড়ে উঠবে না। দেশ বিদেশি পণ্যের বাজারে পরিণত হবে। বাণিজ্যের আড়ালে যুক্তরাষ্ট্র আসলে বঙ্গোপসাগরে তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তিনি বলেন, তুরস্কের লোকজন ঘন ঘন বাংলাদেশে আসছে। তারা এখানে সমরাস্ত্র কারখানা করতে চায়। ছোট দেশ এখানে অনেক দেশের ইপিজেড গড়ে তোলা হচ্ছে যা সংকট তৈরি করবে। তিনি বলেন, পৃথিবীতে গত ১০ বছরে যে বিমান দুর্ঘটনা হয়েছে তার বেশির ভাগ বোয়িং; ফলে বোয়িং কোম্পনির বিমান কিনে আমাদের বাংলাদেশ বিমান তথা বাংলাদেশকে বিপদে ফেলার পায়তারা ঠেকাতে হবে।

তিনি বলেন, কেউ কেউ বলছেন চুক্তি হয়েছে এখন কী করা যাবে কিন্তু চুক্তির ৬নং ধারায় আছে ২ মাস পূর্বে নোটিশ দিয়ে যে কোন পক্ষ চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। বাংলাদেশ সরকার সেই পথ অনুসরণ করুক এটা আমাদের প্রত্যাশা।

জনাব ইনামুল হক খান বলেন, আমি বিজিএমইএ-এর প্রতিনিধি হিসেবে এখানে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছি। আমরা ব্যবসায়ী, বুঝতেই পারেন, আমাদের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। ব্যক্তিগতভাবে হলে হয়তো চুক্তির পক্ষে-বিপক্ষে কিছু বলতে পারতাম। বিজিএমইএ-এর প্রতিনিধি হিসেবে সেটা বলতে পারছি না। তবে এইটুকু বলতে চাই, গার্মেন্টস দেশের প্রধান রপ্তানিমূলক শিল্প খাত। ৪০ লক্ষ শ্রমিক এখানে নিয়োজিত যার মধ্যে ৭০% নারী শ্রমিক। বছরে ৮ থেকে ৯ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় হয় এখাত থেকে। আমাদের প্রতিযোগী আছে ভারত, চীন, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশ। তিনি

বলেন, চুক্তি সমর্থন বা বিরোধিতা নয় জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় শিল্প ও দেশের শ্রমিকদের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে। এ জন্য এককভাবে না সকল বিশেষজ্ঞ ও স্টেক হোল্ডারদের সাথে আলোচনা করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই।

সভাপতির বক্তব্যে বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার দেশের সর্বনাশ করে গেছে। তারা দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করছে এবং বিদেশিদের স্বার্থ রক্ষা করেছে।

কমরেড ফিরোজ বলেন, মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি বাস্তবে দাসত্বের চুক্তি; দেশ বিক্রির গোলামি চুক্তি। এর সাথে নিউ মুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল ইজারা দেওয়ার পায়তারা বন্ধ এবং জাতীয় স্বার্থ বিরোধী পিএসসি বাতিলের দাবিতে সকল বাম-প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল, ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তারা এক সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে আরেক সাম্রাজ্যবাদের হাতে দেশকে সপে দিয়েছে। শ্রম আইন সংশোধন করে বিদেশি কোম্পানির স্বার্থ রক্ষা করেছে। মুনাফার ৫% শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে দেওয়ার কথা ছিল শ্রম আইনে, সেটা সংশোধন করে ১.৫% শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে দেওয়ার আইন করেছে।

উপদেষ্টাদের অনেকেই বলছে বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে তারা জানে না। কিচেন কেবিনেটে সিদ্ধান্ত হতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। সবকিছুতেই তাদের ছিল অত্যন্ত গোপনীয়তা, জনগণ জেনে গেলে তারা সেটা করতে পারবে না। তাই তাদের যারা ক্ষমতায় বসিয়েছিল তারা গোস্যা করলে বিপদ হতে পারে এজন্যই তারা জনগণকে তো নয়ই এমনকি কেবিনেট সদস্যদেরও জানায়নি।

তিনি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুধু নয়, সারা দুনিয়াই চলছে পুঁজিবাদী মুক্তবাজারি অর্থনীতির নিয়মে। ফলে পুঁজির তো ধর্ম মুনাফা, যেখানে মুনাফা সেখানেই যাবে পুঁজি। বাজার দখলের জন্য ২টি বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে। আমেরিকার অর্থনীতি

হামের ভয়াবহতা নিয়ে দায় চাপানো বন্ধ কর

১২ পৃষ্ঠার পর

দুই হাজারের বেশি শিশু আক্রান্ত হয়েছিল। ফলে সতর্কতার কোন বিকল্প নেই এই কথাটি ভুলে যাওয়া হয়েছে, পার্বত্য অঞ্চলের শিশু বলে উপেক্ষা করা হয়েছে যার মারাত্মক পরিনতি এবার দেখছে বাংলাদেশ। পাশাপাশি আর একটি বিষয় গভীর উদ্বেগের। টিকার বিরুদ্ধে অবৈজ্ঞানিক প্রচারণা করাও বেড়েছে। ফলে সরকারের দায়হীনতা এবং এইসব নেতিবাচক প্রচারণা সংকটকে বাড়িয়ে তুলেছে।

হামের প্রাদুর্ভাব যে শুধু ভয়াবহ রূপ নিয়েছে তাই নয় এটি এখন একটি গভীর জাতীয় সংকটে পরিণত হওয়ার আশংকা তৈরি করেছে। ৫০ হাজার শিশু আক্রান্ত হয়েছে। দৃশ্যমান এই সংখ্যা এবং না জানা আরও কতজন আছে এই আশঙ্কা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শারীরিক সুস্থতার জন্য শঙ্কা তৈরি করেছে। হাম কেবল জ্বর এবং শরীরে কিছু লালচে ফুসকুড়ি ওঠার একটি সাধারণ রোগ হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস ও বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই রোগের প্রভাব কেবল চামড়ার ফুসকুড়িতে সীমাবদ্ধ নয়। হামের ভাইরাসের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এর স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমণ করার ক্ষমতা, যা আক্রান্ত শিশুর মস্তিষ্কের ক্ষতি করতে পারে।

হামের এই স্নায়বিক প্রভাব নিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞান দীর্ঘকাল ধরে সতর্ক করে আসছে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই চিকিৎসকেরা লক্ষ্য করেছিলেন যে হামের সংক্রমণের পর অনেক শিশু তীব্র এনসেফালাইটিস বা মস্তিষ্কের প্রদাহে আক্রান্ত হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ হলো ‘সাবঅ্যাকিউট

স্কেলেরোজিং প্যানেনসেফালাইটিস’ বা এসএসপিই।

এসএসপিই এমন এক বিরল কিন্তু জটিলব্যাদি, যা হাম হওয়ার ৭ থেকে ১০ বছর পর প্রকাশ পায়। ইতিহাসের বিভিন্ন মহামারি পরবর্তী পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, উন্নত দেশগুলোতেও যখন টিকাদান কর্মসূচির আগে হামের প্রাদুর্ভাব ছিল, তখন বেঁচে যাওয়া শিশুদের একটি বিশাল অংশ অন্ধত্ব, শ্রবণশক্তি হারানো এবং স্থায়ী মানসিক প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়েছিল।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, যেখানে শিশুদের দীর্ঘমেয়াদি থেরাপি বা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ছিল না, সেখানে হাম-পরবর্তী ‘নিউরো-ডিজঅ্যাবিলিটি’ বা স্নায়বিক পঙ্গুত্ব কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, কম্বো প্রজাতন্ত্রে (ডিআরসি) ২০১৯-২০ সালের ভয়াবহ হাম প্রাদুর্ভাবের সময় দেখা গেছে, পুষ্টিহীনতা এবং বিশেষায়িত স্নায়বিক সেবার অভাবে আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে স্নায়বিক জটিলতার হার ছিল বেশি। একইভাবে ভিয়েতনামে ২০১৪ সালের হামের প্রাদুর্ভাবের পর স্নায়বিক পর্যবেক্ষণ ও পুনর্বাসন না হওয়ায় অনেক শিশু নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক জটিলতার শিকার হয়েছে। ফলে হাম-পরবর্তী সময়ে একটি সমন্বিত পুনর্বাসনব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হামের কারণে যারা মস্তিষ্কের প্রদাহে আক্রান্ত হয়, তাদের মধ্যে অনেক শিশু দীর্ঘমেয়াদি স্নায়বিক বা জ্ঞানীয় সংকটের মুখে পড়ে। ফলে আপাতদৃষ্টিতে সুস্থ হয়ে যাওয়া অনেক শিশু পরবর্তী জীবনে কথা বলতে দেরি করা, শেখার অক্ষমতা, স্মৃতিশক্তি হ্রাস পাওয়া কিংবা মৃগীরোগের মতো স্থায়ী সমস্যায় ভুগতে পারে।

বাংলাদেশে বর্তমানে যে হাজার হাজার শিশু হামে আক্রান্ত হচ্ছে, তাদের অনেকেই দীর্ঘমেয়াদি স্নায়বিক ঝুঁকির আওতায় রয়েছে। ফলে যাদের দায়িত্বহীনতা শিশু মৃত্যু ও শিশুদের ভবিষ্যৎ ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে তাদের শান্তির দাবির পাশাপাশি দ্রুত চিকিৎসা ও পুনর্বাসন খুবই জরুরি। এবার যে শিশুরা আক্রান্ত ও মৃত্যুবরণ করেছে তাদের বাবা মা’দের বিপুল অংশ দরিদ্র। সন্তান হারানোর বেদনা ও সন্তানের ভবিষ্যৎ চিকিৎসা নিয়ে দুর্ভাবনা তাদেরকে তাড়িত করবে। প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা যেমন করতে হবে তেমনি আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসার পাশাপাশি খাদ্য ও পুষ্টি সহায়তা এখন সময়ের দাবি। যারা হামের উপসর্গ নিয়ে, নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে এসেছিলেন এবং পরীক্ষা করা হয়েছে যাদের সেইসব শিশুদের ডাটা বেজ তৈরি করে আগামী পাঁচ বছর তাদেরকে পর্যবেক্ষণ ও চিকিৎসা দেয়া প্রয়োজন। পঙ্গু, বিকলাঙ্গ এবং মানসিক ভারসাম্যহীন শিশু শুধু পরিবারে যন্ত্রণা বাড়ায় না সমাজেও সংকট তৈরি করে। আক্রান্তদের চিকিৎসা সতর্কতা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা দরকার। এই দায়িত্ব কে নেবে? এই ব্যয় বহন করা দরিদ্র পরিবারগুলোর পক্ষে সম্ভব নয়। সন্তানহারা মায়ের যন্ত্রণার ভাগ নেয়া যায় না। ফলে সন্তান হারা মা বাবা আজীবন এই বেদনা বহন করবেন। কিন্তু বেঁচে থাকা শিশুগুলোর যন্ত্রণার লাঘব করার দায়িত্ব নিতে হবে সরকারকে। দায়িত্বহীনতার জন্য দায়ী যারা তাদেরকে শান্তির আওতায় আনা যেমন দরকার তেমনি দায় চাপানোর বিতর্ক বন্ধ করা দরকার।

হামের পর ডেঙ্গু, চিকনগুনিয়ার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া ভীষণ জরুরি।

এখন সামরিক অর্থনীতি ফলে তা টিকিয়ে রাখতে রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতেই আজ দখল-আত্মাসন, লুণ্ঠন-খণ্ডযুদ্ধ, আঞ্চলিক যুদ্ধ তাকে করতে হচ্ছে। যে জন্য মাদুরোকে সন্ত্রীক অপহরণ, ফিলিস্তিনে গণহত্যা, ইরানে হামলা ও তাদের শীর্ষ নেতাদের হত্যা, কিউবাকে হুমকি দেওয়া, চীনকে ঠেকাতে বঙ্গপোসাগর নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশকে তার পক্ষে চাই। ফলে একদিকে অর্থনীতির ক্ষতি, অন্যদিকে সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে এই চুক্তির ফলে।

তিনি গোলটেবিল থেকে নিম্নোক্ত দাবি তুলে ধরেন এবং সরকারকে মানতে বাধ্য করতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

১. সংবিধানের ১৪৫(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অবিলম্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে সংসদে আলোচনা করে চুক্তি বাতিলের উদ্যোগ নেওয়া হোক। একই সাথে দেশ বিক্রির গোলামি চুক্তির সাথে জড়িত ড. ইউনূস, ড. খলিলুর রহমানসহ সকলকে বিচারের আওতায় আনা হোক।

২. অন্তর্বর্তী সরকারের ১৮ মাসের কার্যক্রমের শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হোক।

৩. বিদেশের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি জনসম্মুখে প্রকাশ করে জাতীয় স্বার্থ বিরোধী সকল চুক্তি বাতিল করতে হবে।

৪. নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল ডিপি ওয়ার্ল্ড বা কোন বিদেশি কোম্পানিকে ইজারা দেওয়া পায়তারা বন্ধ কর। লালদিয়া ও পানগাঁও টার্মিনাল ইজারা চুক্তি বাতিল কর।

৫. দ্বিপক্ষীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা চুক্তি GSOMIA, ACSA এর নামে বাংলাদেশের বন্দর, বিমান ঘাটি মার্কিনিদের ব্যবহার করতে দেওয়ার পায়তারা বন্ধ কর। বাংলাদেশকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঘাটি করতে দেওয়া হবে না।

মন্দির ও মসজিদ

সপ্তম পৃষ্ঠার পর

হাজার, আসে তার জন্য ছাপ্প্পর ফুঁড়িয়া নেতার দল—গো-ভাগাড়ে শকুনি পড়ার মতো।—শুধু দশ লক্ষ লাশের আর প্রতিকার হইল না।

মানুষের পশু-প্রবৃত্তির সুবিধা লইয়া ধর্ম-মদান্ধদের নাচাইয়া কত কাপুরুষই না আজ মহাপুরুষ হইয়া গেল।

সকল কালে সকল দেশে সকল লাভ-লোভকে জয় করিয়াছে তরুণ। ওগো বাংলার তরুণের দল—ওগো আমার আঙুন খেলার নির্ভীক ভাইরা, ওই দশ লক্ষ অকালমৃতের লাশ তোমাদের দ্যারে দাঁড়াইয়া! তারা প্রতিকার চায়!

তোমরা ওই শকুনির দলের নও, তোমরা আঙুনের শিখা, তোমাদের জাতি নাই। তোমরা আলোর, তোমরা গানের, তোমরা কল্যাণের। তোমরা বাহিরে এসো, এই দুর্দিনে তাড়াও ওই গো-ভাগাড়ে-পড়া শকুনি দলকে!

আমি শুনিতেছি মসজিদের আজান আর মন্দিরের শঙ্খধ্বনি। তাহা এক সাথে উথিত হইতেছে উর্ধ্বে—শ্রুতার সিংহাসনের পানে। আমি দেখিতেছি, সারা আকাশ যেন খুশি হইয়া উঠিতেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত বাণিজ্যচুক্তি বাতিলের দাবি

সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবিরোধী জোটের সমাবেশ ও বিক্ষোভ

৯ ফেব্রুয়ারি '২৬ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাত্র তিন দিন আগে অনিবার্চিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে 'Agreement on Reciprocal Trade (ART)' (পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি) নামক একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি বাংলাদেশের অর্থনীতি, কৃষি, জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবিরোধী জোটের এই সমাবেশ ও মিছিল থেকে সরকারের প্রতি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানানো হয়, এই চুক্তি বাতিল না হলে তীব্র গণ আন্দোলন অনিবার্য। ১৭ মে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বাসদের সাধারণ সম্পাদক ও জোটের শীর্ষ নেতা বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবিরোধী জোটের নেতৃবৃন্দ কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, মাসুদ রানা, নাসিরুদ্দিন আহমেদ নাসু ও ডা. মুশতাক হোসেন বক্তব্য রাখেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, একটি অনিবার্চিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এখতিয়ার কেবল রুটিন প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনায় সীমাবদ্ধ। কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সেই সীমা লঙ্ঘন করে দেশবাসীকে না জানিয়ে এমন একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে যার মেয়াদ আগামী ১৫ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত।

এই চুক্তিটি মোট ১৭৭ পৃষ্ঠার, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মাত্র ৩২ পৃষ্ঠা জনসমক্ষে প্রকাশ করেছে। আর বাংলাদেশ সরকারতো দেশবাসীকে জানানোর প্রয়োজনই বোধ করছে না। সেই ৩২ পৃষ্ঠার মধ্যেই বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে অসংখ্য অসম শর্ত প্রকাশিত হয়েছে। বাকি ১৪৫ পৃষ্ঠায় কী লেখা আছে তা বাংলাদেশের জনগণ তো দূরের কথা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও প্রকাশ করেনি। এই গোপনীয়তা একটি বিপজ্জনক সংকেত। আগামী ১৫ বছরে আন্তর্জাতিক বাজার দরের চেয়ে বেশি দামে কমপক্ষে ১ হাজার ৫০০ কোটি ডলার



(প্রায় ১ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা) মূল্যের তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG) যুক্তরাষ্ট্র থেকে কিনতে বাধ্য থাকবে বাংলাদেশ। প্রতি টনে আন্তর্জাতিক বাজারের চেয়ে ৭৫ ডলার বা ৯ হাজার টাকা বেশি মূল্যে আগামী পাঁচ বছর প্রতি বছর ৭ লাখ টন গম বাধ্যতামূলকভাবে কিনতে হবে। আন্তর্জাতিক বাজারদরের চেয়ে অনেক বেশি দামে ২৬ লাখ টন সয়াবিন ও সয়াবিনজাত পণ্য আমদানি করতে হবে, যার মূল্য দাঁড়াবে প্রায় ১২৫ কোটি ডলার। তুলা-ফলমূল ও কৃষিপণ্য বাজারদরের বাইরে ৩৫০ কোটি ডলার বা ৪২ হাজার কোটি টাকার অতিরিক্ত ব্যয়ের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। মার্কিন বেসামরিক কোম্পানি বোয়িংয়ের কাছ থেকে বিনা দরপত্রে ৪৫ হাজার কোটি টাকায় ১৪টি উড়োজাহাজ কেনার চুক্তি ইতিমধ্যে গত ৩০ এপ্রিল সম্পন্ন করে ফেলেছে। যা সরকারি ক্রয়বিধির সরাসরি লঙ্ঘন। বাংলাদেশের বাজারে যুক্তরাষ্ট্র ৬ হাজার ৭১০টি পণ্যে শুল্কছাড় পাবে;

বিপরীতে বাংলাদেশ পাবে মাত্র ১ হাজার ৬৩৮টি পণ্যে—যার অধিকাংশই রপ্তানির সামর্থ্য বাংলাদেশের নেই। গত বছর মার্কিন পণ্য থেকে বাংলাদেশ পেয়েছে ১ হাজার ২০০ কোটি টাকার শুল্ক। চুক্তি কার্যকর হলে মাত্র ১০ কোটি টাকা আদায় হবে; হারাতে হবে ১ হাজার ১৯০ কোটি টাকা। সবচেয়ে বিধ্বংসী দিকটি হলো : চুক্তিতে মাছ-মাংস, মুরগি-দুধসহ সব কৃষিপণ্যের অবাধ আমদানির বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এতে বাংলাদেশের পোলট্রি, মৎস্য-ডেয়ারি ও দুগ্ধ খাতে কর্মরত কোটি মানুষের জীবিকা ধ্বংসের মুখে পড়বে। তৈরি পোশাক শিল্পও বিপন্ন হবে। মার্কিন তুলা ব্যবহারে বাধ্যবাধকতা পরিবহন খরচ বাড়াবে, প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়বে বাংলাদেশ।

চুক্তির শর্তানুযায়ী, মার্কিন বাণিজ্য স্বার্থের পরিপন্থি কোনো দেশ—অর্থাৎ চীন, রাশিয়া—এর সাথে বাংলাদেশ কোনো বাণিজ্যচুক্তি করতে পারবে না। ইতিমধ্যে রাশিয়া থেকে জ্বালানি

কিনতে মার্কিন 'ছাড়পত্র' চাইতে হয়েছে। একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্য এটি অপমানজনক। সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়েও নির্ভরশীলতা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ বর্তমানে ৮০% প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম চীন থেকে আনে। এই চুক্তি বাংলাদেশকে একটি নির্দিষ্ট ভূ-রাজনৈতিক শিবিরে ঠেলে দিচ্ছে। এতে বাংলাদেশের কৌশলগত স্বাধীনতা বিপন্ন হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য যে, চীন তাইওয়ান ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে উত্তেজনা বাড়িয়েছে এবং এই অঞ্চলে যুদ্ধের আশঙ্কা বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে মার্কিন নিরাপত্তা কাঠামোর অধীনে টেনে নেওয়ার যে প্রচেষ্টা এই চুক্তিতে দৃশ্যমান, তা বাংলাদেশকে একটি আঞ্চলিক সংঘাতের ঘূর্ণিপাকে ফেলে দেওয়ার ঝুঁকি তৈরি করছে।

সাবেক নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান—যিনি এই চুক্তি স্বাক্ষরে সবচেয়ে তৎপর ছিলেন—দাবি করেছেন যে বিএনপি ও জামায়াতের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করেই এই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এই দাবি একটি গুরুতর রাজনৈতিক প্রতারণা। জামায়াতে ইসলামি এই দাবি প্রকাশ্যে অস্বীকার করেছে। কিন্তু সংসদ চলার দীর্ঘ সময়েও জামায়াতের পক্ষ থেকে এই চুক্তি নিয়ে কোনো নোটিশ দেওয়া হয়নি, কোনো আলোচনা তোলা হয়নি। এতে প্রমাণ হয় জামায়াত নির্লজ্জ মিথ্যাচার করছে। স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানা পয়েন্ট অব অর্ডারে এই চুক্তি সংসদে আলোচনায় তুলতে চাইলে স্পিকার তা 'বিধিবিহীন' বলে আটকে দিয়েছেন। কোন বিধির আওতায় জাতীয় অর্থনীতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণকারী একটি চুক্তির আলোচনা বন্ধ রাখা যায়? আসন্ন সংসদ অধিবেশনেও যদি জামায়াতের পক্ষ থেকে এই চুক্তি বাতিলের দাবিতে কোনো সক্রিয় পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তাহলে জনগণ বুঝবে তারা মিথ্যাচার করছে। সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার সাথে আঁতাত করেই তাঁরা চলছে। বিএনপি সরকার খলিলুর রহমানকে পুরস্কৃত করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বানিয়েছে। আর বলছে এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

শিশু রামিসা ধর্ষণ ও হত্যার বিচার শিশু ও নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে

বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ : মাগুরা

শিশু রামিসা ধর্ষণ ও হত্যার সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ মাগুরা জেলা শাখার উদ্যোগে ২৩ মে চৌরঙ্গী মোড়, মাগুরা জেলা প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ মাগুরা জেলা শাখার সমন্বয়ক প্রকৌশলী শম্পা বসুর সভাপতিত্বে ও সংগঠক আসানুর ইসলামের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সাবেক অধ্যক্ষ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কাজী নজরুল ইসলাম ফিরোজ, বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চের সংগঠক ভবতোষ বিশ্বাস জয়, ঝলক দত্ত।

রাজধানীর মিরপুরের পল্লবীতে সাত বছর বয়সী শিশু রামিসা আক্তারকে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে গলা কেটে হত্যার ঘটনায় গভীর শোক, ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করে বক্তাগণ বলেন, একজন শিশুকে এভাবে নির্মমভাবে হত্যা শুধু একটি পরিবারের জন্য নয়, সমগ্র সমাজের জন্য ভয়াবহ ও আতঙ্কজনক বার্তা বহন করে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আমরা নিহত রামিসার পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই এবং এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাই।



নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, গত সাত দিনে দেশে চারজন কন্যাশিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে শিশু ও নারীর ওপর ধর্ষণ, নির্যাতন ও হত্যার ঘটনা প্রমাণ করে—রাষ্ট্র ও সমাজ শিশু ও নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চরমভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। মাগুরার ৮ বছর বয়সী শিশু আছিয়াকে নির্মমভাবে ধর্ষণ ও

নির্যাতন করে হত্যার ঘটনায় সারাদেশ বিচারের দাবিতে আন্দোলনে शामिल হয়েছিল। এক বছর হয়ে গেল বিচার এখনও পাইনি। বিচারহীনতার রেওয়াজ, সামাজিক অবক্ষয়, নারীকে ভোগের বস্তু হিসেবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থনৈতিক টানা পোড়েন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, মাদক ও সহিংসতার বিস্তার এবং অপরাধীদের

রাজনৈতিক-সামাজিক প্রশ্রয়—এসবই এ ধরনের বর্বরতার পেছনে কাজ করছে।

শুধু বিচ্ছিন্ন কিছু গ্রেপ্তার বা সাময়িক তৎপরতা দিয়ে এই পরিস্থিতির সমাধান হবে না। প্রয়োজন দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা, অপরাধীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক আশ্রয় বন্ধ করা এবং নারী ও শিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক ও সহিংস মানসিকতার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে কার্যকর ভূমিকা রাখা।

সমাবেশ থেকে নিম্নলিখিত দাবিসমূহ তুলে ধরা হয়—

১. রামিসা হত্যাকাণ্ডের দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে

২. সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত সকল শিশু ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনার বিচার দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে

৩. শিশু ও নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

৪. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সমাজে নারী-শিশুবান্ধব সচেতনতা ও মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৫. বিচারহীনতার রেওয়াজ বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত বাণিজ্যচুক্তি বাতিলের দাবি

১৪ পৃষ্ঠার পর

চুক্তিতে তাদের ‘সম্মতি’ ছিল। তাহলে এই সরকার কি জনগণের সরকার, নাকি মার্কিন স্বার্থের সরকার?

গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট ৬-৩ ভোটে ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে : ট্রাম্প প্রশাসন যে International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)-এর আওতায় শুল্ক আরোপ করেছিল, তা সম্পূর্ণ অবৈধ। প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস লিখেছেন, IEEPA রাষ্ট্রপতিকে শুল্ক আরোপের ক্ষমতা দেয় না। শুল্ক আরোপের এই ক্ষমতা মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী কেবল কংগ্রেসের।

এই ART চুক্তির ভিত্তিই ছিল সেই IEEPA-ভিত্তিক শুল্ক হুমকি। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সেই ভিত্তি ধসে পড়েছে। মালয়েশিয়া ইতিমধ্যে একই ধরনের চুক্তি ‘বাতিল ও অকার্যকর’ ঘোষণা করেছে। দেশটির বাণিজ্যমন্ত্রী Johari Abdul

Ghani স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন: ‘It is not on hold. It is no longer there, it’s null and void.’

ইউরোপীয় পার্লামেন্ট চুক্তির অনুসমর্থন স্থগিত রেখেছে। ভারত আলোচনা স্থগিত করেছে। প্রশ্ন একটাই—মালয়েশিয়া পারলে বাংলাদেশ কেন পারবে না?

আমেরিকার অর্থনীতির দিশাহীন পরিস্থিতির বোঝা তারা শুল্ক বাড়িয়ে ৬০টি দেশ ও অঞ্চলের ওপর চাপাতে চাচ্ছে। এর মধ্যে মাত্র ১৯টি দেশ এ পর্যন্ত চুক্তি করেছে। বাকি দেশগুলো এখনও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো চুক্তিতে যায়নি। অথচ, এই শুল্কের বোঝা আমাদের ঘাড়ের ওপর তুলে দেওয়া হচ্ছে। আমরা প্রশ্ন করি—আমরা তা বহন করতে যাব কেন?

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে এই অসম চুক্তি বাতিলের দাবি জানিয়ে বলেন, সরকার যদি আমাদের এ দাবি না মানে, তাহলে এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

প্রসঙ্গ রামিসা ; ধর্ষণ-হত্যার শাস্তি এবং প্রতিকারের সংগ্রাম

শেষ পৃষ্ঠার পর

ময়লা দূর না করে শুধু আয়না মুছলে চেহারা পরিষ্কার দেখা যাবে না। প্রশ্ন উঠেছে, নারী, শিশু কোথায় নিরাপদ? ২০২১ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত ৬৮০টি ধর্ষণ ঘটনার ম্যাপিং করে দেখা গেছে যে, ধর্ষিতার নিজ ঘরেই ১৮৬ জন, অপরাধীর বাড়ি বা প্রতিষ্ঠানে ১৭৯ জন, বাগান-জঙ্গল, পাট খেত ইত্যাদি স্থানে ৯৬ জন, পরিত্যক্ত ভবনে ৯৫ জন, মাদ্রাসায় ২৮ জন, দোকানে ২৫ জন, পরিবহনে ১৭ জন, স্কুলে ১৫ জন এবং মসজিদে ১০ জন ধর্ষিতা হয়েছেন। এর বাইরে ২০২৫ সালে সিলেটে ২ বছরের শিশুকে বিস্কুটের লোড দেখিয়ে এবং চুয়াডাঙ্গায় ২০২৬ সালের মে মাসে বাড়ি পৌঁছে দেবার কথা বলে ৭১ বছরের বৃদ্ধাকে যখন ধর্ষণের খবর আসে তখন এটা পরিষ্কার যে, ধর্ষিতা নারীর ক্ষেত্রে বয়স কোন বিবেচনা নয়।

রামিসার ঘটনা কাঁদিয়েছে মানুষকে। কিন্তু রামিসার আগে যেমন, পরেও তেমনি ধর্ষণ, হত্যা চলছেই। কিছু ঘটনায় মানুষ উত্তাল হয়ে উঠেন আর বাকিগুলো কী হয়? শত শত ঘটনা পত্রিকার পাতায় ঠাঁই পায় আড়ালে থেকে যায় যে কত তার সংখ্যা অনুমান করা ছাড়া উপায় নেই। যেমন ২০২৪ সালের মার্চে মাগুরায় আট বছরের শিশু আছিয়াকে ধর্ষণের ঘটনায় পুরো দেশ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। তখনও মানুষের বিক্ষোভের কারণে দ্রুত বিচার সম্পন্ন হয়েছিল। শিশু আছিয়াকে ধর্ষণ ও হত্যার দায়ে আসামি হিটু শেখকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল। এর চার দিন পর ডেথ রেফারেন্সের নথি হাইকোর্টে পৌঁছায়। রায় ঘোষণা এবং ডেথ রেফারেন্স হাইকোর্টে পাঠানোর এক বছর পূর্ণ হলেও পরবর্তী অগ্রগতি কতটুকু, তা আজও অজানা। অথচ ছুটির দিন বাদে টানা শুনানি করে মাত্র ১৪ কার্যদিবসে আলোচিত এই মামলার বিচারকাজ শেষ হয়েছিল। শুধু আছিয়া হত্যাকাণ্ডই নয়, এমন বহু বেদনাকাতর সংবেদনশীল মামলার কাগজ আদালতে ধুলোর আন্তরগণে ঢাকা পড়ে আছে। ধর্ষণের দায় স্বীকার করার পরও বছরের পর বছর মামলা ঝুলে থাকে, নিষ্পত্তি হয় না। আবার রায় হলেও তা কার্যকর হয় না, উলটো অনেক আসামি জামিনে বের হয়ে আসে। ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধের পরও শাস্তি না হওয়ার আক্ষেপ বুকে নিয়েই বেঁচে থাকাতে হয় নির্যাতিত পরিবারগুলোকে। কেউ যখন দেখেন তার প্রিয় সন্তানের খুনি তার চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন কি ধিক্কার তৈরি হয় না রাষ্ট্র, সমাজ ও বিচারের প্রতি?

আছিয়ার বেদনা না ভুলতেই রাজধানীতে নির্মমতার শিকার হলো দ্বিতীয় শ্রেণিপড়িয়া সাত বছরের শিশু রামিসা। নারী ও শিশুর জীবন, নিরাপত্তা তাহলে কোথায়? আমাদের বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রতা যেন অপরাধীদের কাছে এক ধরনের প্রশ্রয়ের বার্তা দেয়। নির্যাতিতার দোষ খুঁজে বের করা, পোশাকের দোহাই দেওয়া, সাজগোজ করাকে অজুহাত করা এবং শয়তান ভর করার মতো আত্মপক্ষ সমর্থন করার নানা দৃষ্টান্ত দেখা গেছে ইতিমধ্যে। কার্যকর ও দৃশ্যমান কোনো শাস্তি না থাকায় নারীর প্রতি সহিংসতা বা ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধ জ্যামিতিক হারে বেড়েই চলেছে।

সব খবর পত্রিকায় আসে না, পরিসংখ্যান সব বলে না, কিন্তু যা বলে তা কি আতঙ্কিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়? বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ও ব্র্যাকের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত ‘নারী ও শিশুনির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পদ্ধতিগত প্রতিবন্ধকতা এবং উচ্চ প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিরসনের কার্যকর উপায় চিহ্নিতকরণ’ শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদন গত ২ মে প্রকাশ করা হয়। সেই প্রতিবেদনের তথ্য অত্যন্ত ভয়াবহ : দেশে নারী ও শিশুনির্যাতনের মামলায় সাজার হার মাত্র ৩ শতাংশ। প্রায় ৭০ শতাংশ মামলায় খালাস পেয়ে যাচ্ছে আসামিরা। আইন অনুযায়ী ১৮০ কার্যদিবসের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তির বিধান থাকলেও বাস্তবে একটি মামলা শেষ হতে গড়ে সময় লাগছে ৩ বছর ৭ মাস। প্রতিটি মামলায় গড়ে ২২ বার শুনানির তারিখ পড়েছে। প্রতিবার শুনানিতে স্বজনরা অপমানিত হন, বেদনায় ভারাক্রান্ত হন আর বাড়তে থাকে ক্ষোভ কিংবা অসহায়তা।

এই এক পরিসংখ্যানেই যথেষ্ট আমাদের বিচারব্যবস্থার গতি এবং চিত্র বুঝতে পারার জন্য। কোন অপরাধের ঘটনা ঘটার পর মামলা হওয়া, আসামি ধরা পড়া এবং সাজা হওয়ার এই পুরো প্রক্রিয়া শেষ করতে কোনো কোনো মামলায় ১০ বছর বা তারও বেশি সময় লেগে যায়। অনেক সময় রায় হওয়ার আগেই মামলার বাদী মারা যান। শুধু তাই নয়, আসামি জামিনে বের হয়ে এসে বাদীকে জীবননাশের হুমকি দেওয়ার ঘটনাও অহরহ ঘটে। এছাড়া এটা কে না জানে যে, থানায় মামলা করতে গেলে প্রশাসন, প্রভাব এবং পয়সার কী গুরুত্ব। কিছু আপাত নিরীহ পরামর্শ দেওয়া হয়, যেমন মামলা করে কী লাভ? কোন ফল পাবে না, শুধু টাকা খরচ। বিপদ বাড়বে ইত্যাদি। আবার গ্রাম্য মাতব্বর বা প্রভাবশালী মহল সালিশ বৈঠকের

ঢাবির অধ্যাপক সা’দ উদ্দীনের মৃত্যুতে শোক



বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ১৫ মে গণমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক শিক্ষক বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক এ কে এম সা’দ উদ্দিন-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে কমরেড ফিরোজ বলেন, অধ্যাপক এ কে এম সা’দ উদ্দিন ছাত্রজীবনে বামপন্থি রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক। তিনি প্যালেস্টাইন সংহতি আন্দোলনসহ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ও স্বৈরাচার বিরোধী প্রগতিশীল আন্দোলনের অন্যতম সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছেন। স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের সময় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার প্রতিবাদে কলাভবনের খোলা আকাশের নিচে ‘প্রতীকী ক্লাস’-এর প্রথম লেকচার তিনিই দিয়েছিলেন।

বিবৃতিতে তিনি তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার, বন্ধু বান্ধব ও সহকর্মীদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান।

মাধ্যমে লোক দেখানো শাস্তি, জরিমানা করে মীমাংসা করা আর অন্য দিকে নানারকম ভয়ভীতি দেখিয়ে ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার নজিরও কম নয়।

কয়েকটা ঘটনা মনে করা যেতে পারে। ২০১৭ সালে টাঙ্গাইলের মধুপুরে চলন্ত বাসে জাকিয়া সুলতানা রূপাকে গণধর্ষণ ও হত্যায় ব্যাপক আন্দোলন হয়েছিল। ওই মামলার বিচার থেকে রায় পর্যন্ত ছয় মাসও লাগেনি। রায়ে তিনজনকে মৃত্যুদণ্ড দেন আদালত। কিন্তু উচ্চ আদালতে দীর্ঘ শুনানি শেষে তিন আসামিকেই সাজা কমিয়ে সাত বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

গত ১ মার্চ চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে গহিন জঙ্গলে উদ্ধার হওয়া সাত বছরের শিশু জালাতুল নাইমা ইরার রক্তাক্ত ছবিটি ভুলবার নয়। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে বাবু শেখ নামের একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শিশুটিকে ধর্ষণের চেষ্টা শেষে গলা কেটে জঙ্গলে রেখে যাওয়া হয় বলে পুলিশের তদন্তে উঠে আসে। কিন্তু তিন মাস পার হলেও ওই ঘটনায় এখনো অভিযোগপত্রই দিতে পারেনি পুলিশ।

কুমিল্লার তরুণী সোহাগী জাহান তনু হত্যা মামলার বিচার শুরু হয়নি দীর্ঘ ১০ বছরেও। ওই ঘটনাও সারা দেশে আলোড়ন তৈরি করেছিল। ফেনীতে ২০১৯ সালে আলোচিত মাদরাসা ছাত্রী নুসরাত জাহান রাফি হত্যা মামলার রায়ে ১৬ জনের মৃত্যুদণ্ড হয়। সাত বছর পরও ওই মামলা হাইকোর্টে শুনানির অপেক্ষায় আটকে আছে।

শাস্তিহীন অপরাধী ও বিচারহীন অপরাধের ফলে দুর্বৃত্ত আজ বেপরোয়া। তাই কমছে না হত্যা ও ধর্ষণ। মে মাসে দেশে অন্তত ৬৪টি রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনায় ৫ জন নিহত ও ২৮৯ জন আহত হয়েছেন। একই সময়ে ৬৬টি গণপিটুনি ও সহিংসতার ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৩১ জন। এ ছাড়া গত মাসে ৮৩ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন, যাঁদের প্রায় ৭০ শতাংশের বয়স ১৮ বছরের নিচে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) তথ্য অনুযায়ী, দেশে ২০১৬ সাল থেকে ২০২৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত অন্তত ১১ হাজার ৯৩৪টি শিশু নির্যাতনের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। এসব ঘটনায় মামলা করা হয়েছে ছয় হাজার ১৩৫টি। একই সময়ে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ছয় হাজার ৩১ জন শিশু, যার মধ্যে পাঁচ হাজার ৬৩১ জন মেয়ে এবং ৪০০ জন ছেলে শিশু। ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে অন্তত ৩১০ জন শিশুকে। ভাবা যায়! কতটা নিরাপত্তাহীন আমাদের শিশুরা।

একটা দেশ তাঁর ভবিষ্যৎ তৈরি করে শিশুদের

মাধ্যমে। শিশুদের চোখে স্বপ্ন তৈরি করা সমাজের কাজ কিন্তু আমাদের শিশুরা পথ চলছে, বড় হচ্ছে দুঃস্বপ্ন আর আতঙ্ক নিয়ে। রামিসার খোলা চোখ যেন তাকিয়ে আছে আর প্রশ্ন করছে, আমাদের জন্য কেমন বাংলাদেশ তৈরি করছো তোমরা? অপরাধীর শাস্তির পাশাপাশি শিশুদের স্বস্তির সমাজ কী তৈরি হবে না? রামিসা হত্যার রায়ের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, ‘শিশু ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের এ মামলা কেবল একটি ফৌজদারি বিচারিক কার্যক্রম নয়, এটি আমাদের সমাজের বিবেক-মানবতা, আইনশৃঙ্খলাব্যবস্থা এবং আইনের শাসনের প্রতি এক গভীর ও কঠিন পরীক্ষা। একটি নিষ্পাপ শিশুর জীবন নির্মমভাবে নিভিয়ে দেওয়ার অভিযোগে করা এ মামলার প্রতিটি পৃষ্ঠা বেদনা-ক্ষোভ, উদ্বেগ ও ন্যায়বিচারের প্রত্যাশায় পরিপূর্ণ।’ জনগণেরও সেটাই চাওয়া, ন্যায়বিচারের প্রত্যাশা যেন হতাশার কালো ছায়ায় ঢেকে না যায়।

সমাজে এই ধর্ষকামী মানসিকতা তৈরি হলো কেন? শ্রেণি বিভক্ত সমাজে নারী এবং শিশু সবসময় সহজ টার্গেট। দাস সমাজে দাসীদের সঙ্গে আচরণ, সামন্ত সমাজে প্রজার পরিবারের নারীদের প্রতি মনোভাব এবং পুঁজিবাদী সমাজে নারীকে পণ্য বানানোর প্রভাব বিবেচনা করে এর কার্যকারণ খুঁজে না দেখলে ঠিক বুঝতে পারা যাবে না কেন এসব ঘটে আর প্রতিকারেরই বা পথ কী? নারী অধস্তন, নারী ভোগ্যপণ্যের মতো, নারী পাপের উৎস, নারী অসহায়, নারীর পোশাক চলাফেরা পুরুষকে উত্তেজিত করে এসব কথা যখন সমাজে চলতে থাকে আর নারী যখন সস্তা শ্রমের উৎস তখন নারীর প্রতি যে মানসিকতা তৈরি হয় তা ধর্ষণের মনস্তত্ত্ব তৈরি করে। তখন সে আর পোশাকের আড়ালে বা ঘরে থেকেও নিরাপদ থাকতে পারে না।

শাস্তি হয়তো সাময়িক সমাধান, কিন্তু সমাজে স্বস্তি আনতে হলে নারীর মর্যাদা এবং স্বাধীনভাবে পথ চলার অধিকারের সংগ্রাম শক্তিশালী করতে হবে। সাথে সাথে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে সমাজ পরিবর্তন এবং সমাজতন্ত্র অভিযুক্ত লড়াইয়ে পরিণত করতে হবে। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। লজ্জায় বা ভয়ে কুঁকড়ে যাওয়া নয়, নিজেকে আড়াল করা নয়, প্রতিবাদ প্রতিরোধের পথে নামার মাধ্যমেই এই কুৎসিত মানসিকতার প্রতিরোধ করা সম্ভব। রামিসার খোলা চোখ, ইরার কেটে ফেলা গলা আর আগুনে পুড়তে থাকা নুসরাতের আর্তচিৎকার আমাদেরকে প্রতিরোধের সংগ্রামে নামার আহ্বান জানায়।

রামিসা; ধর্ষণ-হত্যার শাস্তি এবং প্রতিকারের সংগ্রাম

মে ১৯ থেকে জুন ৭, ২০২৬। নিহত রামিসার কেটে ফেলা মাথা আর ক্ষতবিক্ষত দেহ পাওয়া এবং সোহেল-স্বপ্না এই দুইজনের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা হলো ১৯ দিনের মাথায়। এই দিনগুলো যেন বেদনা-ক্ষোভ, প্রত্যাশা ও প্রতিকারের আশায় কেটেছে দেশবাসীর। মানুষের বিশেষত শিশুদের প্রতি নৃশংসতা ও হত্যা শুধু বেদনা তৈরি করে না, বিক্ষোভের জন্ম দেয় এবং বিবেককে জাগিয়ে তোলে। যা ভবিষ্যতে মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পথ তৈরি করার আশা জাগায়। বিচারক তাঁর রায়ে উল্লেখ করলেন, ‘যখন কোনো শিশু যৌননির্যাতন, সহিংসতা কিংবা হত্যার মতো জঘন্য অপরাধের শিকার হয়, তখন তা শুধু একটি পরিবারকে নয়, সমগ্র সমাজকে গভীরভাবে আহত করে এবং রাষ্ট্রের ন্যায়বিচারব্যবস্থার কার্যকারিতাকেও প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। শিশুদের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা একটি সভ্য ও মানবিক রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব’। ঢাকার পল্লবীতে আট বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যার মামলার রায়ের পর্যবেক্ষণে আদালতের এই বক্তব্য যেন রাষ্ট্রকে মনে করিয়ে দেয় তাঁর দায়িত্বের কথা।

২০ মে পত্রিকায় রামিসার নৃশংস হত্যার খবরে শিউরে উঠেছিল দেশের মানুষ। একটা শিশুর গলা কেটে বালতিতে রেখেছে খুনি। সন্তানকে খুঁজে না পেয়ে পাশের ফ্রাটের দরজার বাইরে স্যান্ডেল দেখে যখন দরজায় ধাক্কা দিয়ে



রামিসাসহ সকল শিশু-নারী ধর্ষণ, হত্যার সাথে জড়িতদের শাস্তি দাবি। হাম-এ শিশুর মৃত্যুতে উদ্বেগ, নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ দাবি ২৩ মে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বেগে মা ডাকছেন তাঁর আদরের সন্তানকে, তখন ঘরের ভিতরে তার সন্তানকে গলা কেটে হত্যা করা হচ্ছে। কেটে ফেলা মাথাটা পানির বালতিতে চুবিয়ে রেখে এক নারী দরজা খুলে বললো, রামিসা এখানে নেই। মা জোর করে ঘরে ঢুকে পড়েছেন। রক্তাক্ত ঘর, বালতিতে চুবিয়ে রাখা সন্তানের মাথা, মায়ের আহাজারি ইতিমধ্যে স্ত্রীর সহায়তায় হত্যা ও ধর্ষণকারী জানালার গ্রিল

খুলে পালিয়ে গেছে। নৃশংসতা বোঝাবার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু না আরও ভয়ংকর বর্বরতার চিত্র দেখেছে মানুষ। শিশুর শরীর ক্ষতবিক্ষত, এতটুকু শরীরে নির্মম আঘাতের চিহ্ন, আর তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। কোন মানবিক বোধসম্পন্ন মানুষ এই ঘটনার বিবরণ পড়ে সুস্থ থাকতে পারেন? যদি কেউ তার সন্তান, তার স্বজন অথবা চারপাশের উচ্ছল শিশুদের মুখের দিকে তাকান,

এই ঘটনার বিবরণ শুনে তাঁর বুকের ভেতরে কি হাহাকার তৈরি হবে না? এ কোন সমাজে বাস করছি আমরা? এই ঘটনায় কেঁপে উঠেছিল সারা দেশ, বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছিলেন এক মাসের মধ্যেই এই নৃশংসতার বিচার হবে।

৭ জুন সকাল ১১ টায় রাজধানীর পল্লবীতে আট বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনায় আসামি সোহেল রানা ও তাঁর স্ত্রী স্বপ্না আক্তারের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এ ছাড়াও সোহেল রানাকে ৫ লাখ টাকা ও স্বপ্নাকে ২ লাখ টাকা জরিমানা করেছেন আদালত। হত্যাকাণ্ড সংঘটনের ১৯ দিন এবং মামলা দায়েরের ১৮ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত, আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন, অধিকাংশ সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ ও আসামিদের সাফাই সাক্ষ্যসহ যাবতীয় বিচারিক কার্যক্রম শেষে মামলাটির রায় ঘোষণা দেশের বিচার প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক। মানুষ বলতে পারবে অন্তত একটা দৃষ্টান্ত তৈরি হলো।

রামিসা আমাদের সমাজকে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এই আমাদের সমাজ, যেখানে শিশুরা সবচেয়ে নিরাপত্তাহীন। আয়না কখনো মিথ্যা দেখায় না। প্রতিবিশ্ব দেখানোর জন্য শুধু উলটো হয়ে আসে ছবিটা। মানুষের মাথা তাকে আবার সোজা করে দেখে। মুখের এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

জাতীয় বাজেটে কৃষি খাতে উন্নয়ন বরাদ্দের ৪০ ভাগ বরাদ্দের দাবি

সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের স্মারকলিপি প্রদান

কৃষিতে ভর্তুকি বাড়াতে হবে
উৎপাদন ব্যয় কমাতে হবে

সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের উদ্যোগে ১৭ মে '২৬ সারাদেশে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে অর্থমন্ত্রী বরাবর ২০২৬-২৭ অর্থবছর জাতীয় বাজেটের উন্নয়ন খাতের বরাদ্দের ৪০ শতাংশ কৃষি খাতে বরাদ্দ করা; খেতমজুরদের জন্য সারা বছরের কাজের নিশ্চয়তা প্রদান, আর্মি রেটে রেশন সরবরাহ, এবং উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য ও লাভজনক বাজারমূল্য নিশ্চিতকরণের দাবিতে স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

দেশব্যাপী পালিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটি সভাপতি বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সম্পাদক নিখিল দাস, দপ্তর সম্পাদক জুলফিকার আলী ও সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন। সমাবেশ শেষে নিখিল দাস, জুলফিকার আলী ও জসিম উদ্দিনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল অর্থমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করেন।

ঢাকা, রংপুর, ফেনী, চাঁদপুর, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাট, খুলনা, সিলেট, হবিগঞ্জ, ঝিনাইদহ,



নওগাঁ, চট্টগ্রাম, যশোর, কুড়িগ্রামসহ বিভিন্ন জেলায় স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, জাতীয় বাজেট শুধু রাষ্ট্রের এক বছরের আয়ব্যয়ের একটি পরিকল্পনাই নয়; এটি সরকারের উন্নয়ন দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলনও বটে।

তিনি বলেন, ৭ জুন সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হবে আর ১১ জুন জাতীয় সংসদে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট পেশ করা হবে আলোচনার পর তা পাশ হবে। সেই বাজেট প্রস্তাবের প্রাক্কালে আমরা দেশের প্রান্তিক জনগণ খেতমজুর-ভূমিহীন, দরিদ্র-মাঝারি কৃষক ও আদিবাসীদের পক্ষ থেকে সরকারের প্রতি দাবি জানাতে এসেছি—কৃষি খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির।

জিডিপিতে কৃষির অবদান ১১% আর শ্রমশক্তির ৪৪%-এর বেশি মানুষ কৃষির সাথে

যুক্ত। ২০০০-এর দশকের শুরুর দিকে: কৃষি খাত মোট বাজেটের প্রায় ৫-৭% পেত ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এই অনুপাত কমে ৩-৫%-এর ঘরে নেমেছে; এতে প্রকাশ পায় কৃষি ও কৃষকসমাজ রাষ্ট্রীয় বৈষম্যের শিকার। এই বৈষম্য পরাধীন পাকিস্তানি শাসনামলে যেমন ছিল, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরও তা গত ৫৫ বছর ধরে চলে আসছে।

অর্থনীতিবিদদের মত হলো কৃষিতে মাত্র ১% প্রবৃদ্ধি ঘটলে বেকারত্ব কমে ৩%। স্বাধীনতার পর গত ৫৫ বছরে কৃষকেরা গড়ে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়িয়েছে ৩ শতাংশ হারে। তাদের অবদানে দেশ এখন চাল উৎপাদনের বিশ্বে তৃতীয়। একইভাবে সবজি-ফলসহ সকল খাতে কৃষি উৎপাদন বেড়েছে, অথচ কৃষক ধানসহ তাদের ফসলের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত। কৃষকের

উৎপাদিত ফসল থেকে থেকে মুনাফা লুটে নিচ্ছে অকৃষক মধ্যস্বত্বভোগী ফাঁড়িয়া, ব্যবসায়ী সিভিকেট ও চাতাল মালিকরা।

তিনি বলেন, সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট দীর্ঘদিন ধরে বাজেটে কৃষি খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে আসছে—কারণ কৃষিতে উৎপাদন ব্যয় কমলে লাভ বাড়বে। বর্তমানে সার-বীজ, কীটনাশকসহ কৃষি উৎপাদনের উপকরণের দাম ও জ্বালানি ডিজেলের দাম ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। অন্যদিকে, বিএডিসি অকার্যকর হওয়ায় কৃষকরা বেসরকারি একচেটিয়া ব্যবসায়ী সিভিকেটের কবলে জিম্মি হয়ে পড়েছেন—এরা খেয়ালখুশিমতো কৃষি উৎপাদনের উপকরণের দাম নির্ধারণ করছে। এদের সরবরাহকৃত ভেজাল সারের কারণে জমির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে, মাটির গুণমান কমছে, ফলন কমে যাচ্ছে। তাই বাজেটে বরাদ্দ বাড়িয়ে বিএডিসিকে পূর্ণ সচল করা হলে ভর্তুকি মূল্যে সরাসরি কৃষকের হাতে সার ও বীজ, কীটনাশক পৌঁছে দেওয়া যাবে।

তিনি আরও বলেন, খেতমজুর ও ভূমিহীনদের সারা বছর কাজ থাকে না। কারণ, কৃষি আবাদ হয় মৌসুমীভিত্তিক। বাংলাদেশের কৃষি প্রধানত তিনটি মৌসুমে বিভক্ত—খরিপ (আমন), রবি (বোরো) এবং গ্রীষ্মকালীন ফসল। প্রতিটি ফসল রোপণ থেকে ফসল তোলা পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ে বা ফসলী মৌসুমের মধ্যেই হয়ে থাকে। ফসল তোলার পর থেকে পরবর্তী রোপণ মৌসুম শুরু হওয়ার মধ্যবর্তী সময়—যাকে ‘লিন পিরিয়ড’ অফ-সিজন বা খরা মৌসুম বলে, সে সময় খেতমজুরদের কাজ থাকে না, থাকে না অন্য এরপর পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১